সম্পূর্ণ উপন্যাস

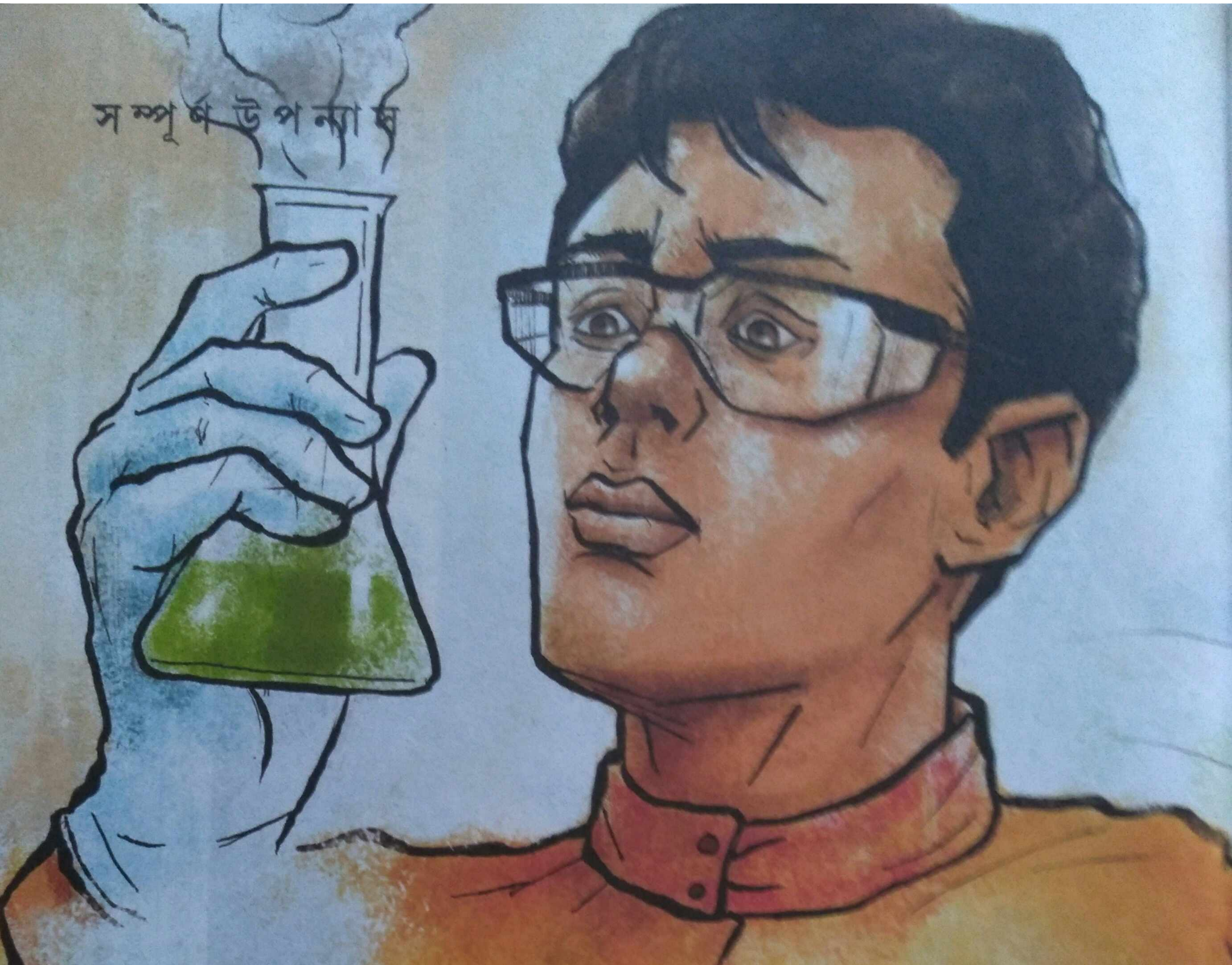

মহীদাদুর অ্যান্টিডোট

দীপান্বিতা রায়

ছবি: কৌশিক মিত্র

বাড়ি ফিরতে আজ একটু দেরিই হয়েছে নয়নের। তার সাড়ে তিনশো তলার ব্যালকনির গ্যাংওয়েতে এয়ারক্যাবটা যখন দাঁড়াল, তখন হাতের সোলার ওয়াচের দিকে তাকিয়ে নয়ন দেখল প্রায় আটটা বাজে। খিদে পাচ্ছে বেশ। সাধারণত ল্যাবরেটরি থেকে বেরনোর আগে সে হালকা স্ন্যাকস খেয়ে নেয়। কিন্তু আজ খাওয়া হয়নি। আসলে বেশ খানিকটা অন্যমনস্ক ছিল বলেই হয়তো খাওয়ার ব্যাপারটা

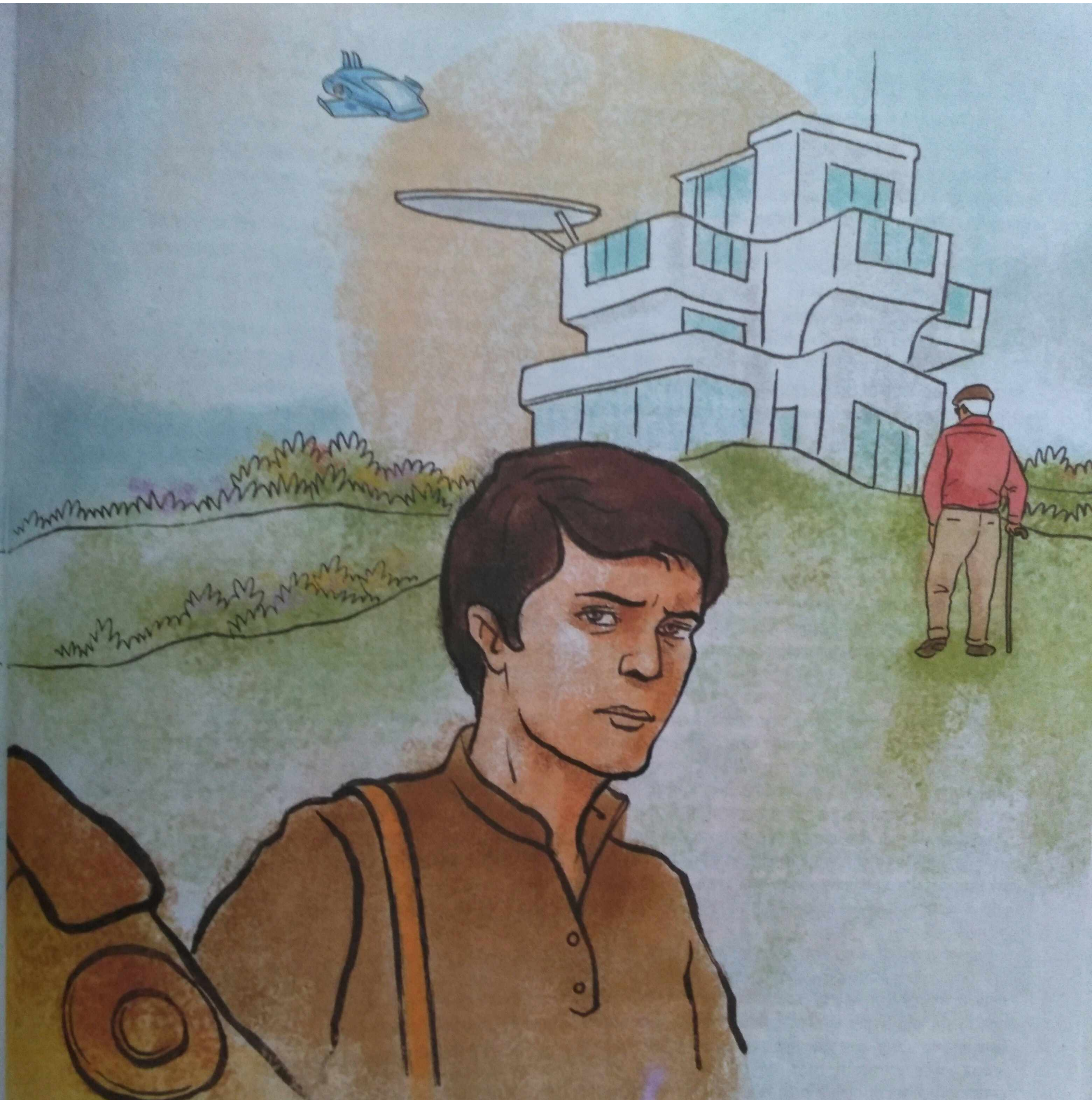

মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন সেটা পেটের ভিতর থেকে দিব্যি জানান দিচ্ছে। লম্বা করিডর দিয়ে হেঁটে এসে নয়ন নিজের ফ্ল্যাটের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে রে ব্যান্ডটা বের করে টিপল। একটা সরু আলোর রেখা তালার ফুটোর ভিতর ঢুকে যেতেই দরজাটা খুলে গেল। বসার ঘরের সোফায় ভোলু বসে আছে। নয়নকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "শুভসন্ধ্যা। আজ তোমার একটু দেরি হয়েছে।"

"কাজের চাপ ছিল," জুতো খুলতে-খুলতে বলল নয়ন।

"খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই। আজ জলঝাঁঝির সঙ্গে কুড়মুড়ে করে ভাজা অক্টোপাস দিয়ে একটা চমৎকার ডিশ বানিয়েছি। খেয়ে দেখো, ভাল লাগবে। আগে কফি দেব এক কাপ।"

"না, কফি নয়। খাবারও একটু পরে দিয়ো। আগে আমাকে একটা ঠান্ডা শরবত দাও। বড্ড ক্লান্ত লাগছে।"

"নিশ্চয়ই। তুমি পোশাক বদলাও। আমি নিয়ে আসছি।"

জামাকাপড় বদলাতে গিয়ে একেবারে স্নানটাই সেরে নিল নয়ন। ফিটফাট হয়ে খাবার ঘরে আসতেই লম্বা গ্লাসে শরবত নিয়ে এল ভোলু। হালকা সবজেটে হলুদ রং। উপরে বরফের কুচি ভাসছে। গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল নয়নের। খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করল, "দারুণ খেতে হয়েছে তো। কী দিয়ে বানালে?"

"তোমার বারান্দাবাগানে একটা ছোট-ছোট সবুজ পাতার গাছ আছে, যেটাকে তুমি পুদিনা বলো। সেইটার সঙ্গে লেবুর রস দিয়েছি। আর-একটা সেই অদ্ভুত মশলা বানিয়েছিলে কীসব বীজ দিয়ে। ভারী

সুন্দর গন্ধ। সেটাও ভেজে গুঁড়ো করে উপরে দিলাম।"

নয়নের খাবার ঘরে একটা শরবত ক্যাবিনেট আছে। প্রায় দু'শো রকম শরবত সেখানে পারমুটেশন-কম্বিনেশন করে বানানো যায়। কিন্তু ভোলু সেখান থেকে শরবত না নিয়ে নিজে বানিয়েছে। আসলে ভোলুর মতো রোবটদের মাথায় একটা বিশেষ ধরনের যন্ত্র বসানো থাকে। তার সাহায্যে ওরা ঠিকঠাক বুঝতে পারে মানুষ কী চাইছে। এক-এক সময় মনে হয় যেন পুরোটা যান্ত্রিক নয়, সত্যিই বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। একটু বেশি দাম দিয়ে ভোলুকে কিনেছে বলে তাই মনে-মনে নিজের উপর একটু খুশিই হল নয়ন।

তবে এরকম দামি রোবটের আবার কতগুলো অসুবিধেও আছে। এরা খুব বেশিমাত্রায় সংবেদনশীল। মালিকের সব কাজকর্মের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখে। নয়ন যখন তার কম্পিউটারে কোনও কাজ করে, তখন ভোলু বেশ মন দিয়ে সেটা দেখে। নয়ন জানে ভোলুর দেখা মানে সেগুলো সবই তার মেমরিতে লোড হয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজনমতো সেই তথ্য সে কাজে লাগাতে পারবে।

অনেক রোবটের মালিক এটা পছন্দই করে। কারণ তা হলে তার সব কাজকর্মের একটা ব্যাক-আপ বাড়ির রোবটের কাছে থেকে যায়। কোনও কারণে নিজের কম্পিউটার থেকে কিছু হারিয়ে গেলে অসুবিধে হয় না। তা ছাড়া কিছু ভুলে গেলে বা খুঁজে না পেলেও রোবট সাহায্য করতে পারে। কিন্তু নয়নের এটা ঠিক ভাল লাগে না। তার কাজকর্ম সারাক্ষণ কেউ লক্ষ করছে, সে যন্ত্রমানব হলেও ব্যাপারটা তার পছন্দ নয়। তাই বাড়িতে নিজের মতো করে কিছু করার থাকলে সেটা নিয়ে বসার আগে সাধারণত নয়ন ভোলুকে সুইচ্‌ড অফ করে দেয়।

কিন্তু আজ দাদুর সঙ্গে কথা বলার আগে কি ভোলুকে সুইচ্‌ড অফ করার দরকার আছে? একটু ভাবে নয়ন। দুপুরবেলা যখন সে নিজের ল্যাবে কাজ করছে, সেই সময় তার মনোবাহীতে প্রথমে একটা অ্যালার্ট এসেছিল। মহীদাদু পাঠিয়েছিলেন অ্যালার্ট মেসেজ। হাতের কাজটা সামলে নিয়ে মনোবাহীতে দাদুর সঙ্গে যোগাযোগ করে নয়ন বুঝতে পারল দাদু তাকে সোলার ডায়েরি দেখতে বলছেন। কিন্তু সোলার ডায়েরির মেসেজটা খুলে প্রথমটায় একটু ঘাবড়েই গিয়েছিল নয়ন। কী একটা অচেনা, অদ্ভুত ভাষায় কয়েকটা লাইন লেখা।

নয়ন নিজে বাংলা আর এসপারেন্তো দুটোই খুব ভালভাবে জানে। এই সৌরজগতে এখন আর দুটোর বেশি ভাষা জানার প্রয়োজনও হয় না। চেনা মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য মাতৃভাষা আর পৃথিবীর বাকি সকলের জন্য এসপারেন্তো। কিন্তু মেসেজটা এই দুটো ভাষার কোনওটাতেই নয়।

অবশ্য মেসেজটা ভাল করে কয়েকবার পড়ার পরই ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল নয়নের। ছেলেবেলায় একবার সে প্রায় মাসচারেক মহীদাদুর বাড়িতে ছিল। তার মা সেসময় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। মায়ের দুটো কিডনি আর লিভার বদলাতে হয়। অপারেশনটা খুবই মামুলি। কিন্তু তারপর একটা বেশ লম্বা বিশ্রামের দরকার ছিল। সাধারণত এরকম ক্ষেত্রে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ট্রেন্‌ড রোবট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সে সব দেখাশোনা করে। আর বাচ্চাদের নিয়ে গিয়ে রাখা হয় সরকারি কেয়ার সেন্টারে। সেখানে থাকা-খাওয়া, খেলাধুলো, লেখাপড়া সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে। মা সুস্থ হলে আবার বাচ্চাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। নয়নের ক্ষেত্রেও সেরকমই ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু মহীদাদু কেন জানা নেই, সরকারি দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করে আবেদন করেছিলেন যে এই চার মাস নয়নকে তিনি নিজের কাছে রাখতে চান।

সাধারণত এরকম আবেদন কেউ করে না। করলে গ্রাহ্য হওয়ার কথাও নয়। কিন্তু মহীদাদু নিজে যেহেতু খুব নামকরা বিজ্ঞানী, তাঁর অনেক আবিষ্কার সরকারের কাজে লেগেছে, তাই হয়তো আবেদন নামঞ্জুর হয়নি। মা সুস্থ হয়ে ওঠা পর্যন্ত নয়ন ছিল মহীদাদুর বাড়িতে, দাদু আর দিদার তত্ত্বাবধানে। আর এই চারটে মাস বোধ হয় ছোট্ট নয়নের জীবনের সবচেয়ে আনন্দের সময়। নানা রকম কথা হত দাদুর সঙ্গে। অনেক অদ্ভুত জিনিস দেখাতেন দাদু। সেসব এখন আর অবশ্য নয়নের ভাল করে মনে নেই। কিন্তু সেই সময়েই এই হরফগুলো তাকে চিনিয়েছিলেন মহীদাদু। বহু বছর আগে নাকি পৃথিবীতে এই লিপি চালু ছিল। একে বলে দেবনাগরী। দাদুর একসময় পুরনো জিনিস সংগ্রহের নেশা ছিল। তখনই এই লিপির সন্ধান পান। এর উচ্চারণের সঙ্গে বাংলার বেশ মিল আছে। তবে অক্ষরগুলো অনেকটাই অন্য রকম দেখতে।

নয়ন হরফগুলো চিনে নেওয়ার পর দাদু তার সঙ্গে একটা ভারী মজার খেলা খেলতেন। দেবনাগরী হরফে বাংলা লিখে সে আর দাদু পরস্পরকে মেসেজ পাঠাত। দিদাকে সেটা বলা হত না। দিদা তাতে রেগে যেতেন আর ছোট্ট নয়ন খুব মজা পেত।

অনেকদিনের অনভ্যাস। তাই প্রথমটায় নয়নের মনে হয়েছিল সে বোধ হয় হরফগুলো ভুলে গিয়েছে। কিন্তু সামান্য চেষ্টাতেই মনে পড়ল আর চিঠিটা পড়ে নয়ন বুঝতে পারল দাদু লিখেছেন, রাতে বাড়ি ফিরে যেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে নয়ন। বিশেষ জরুরি দরকার আছে। কিন্তু দরকারটা কি গোপনীয় কিছু? না হলে হঠাৎ দাদু দেবনাগরী ব্যবহার করেছেন কেন? নাকি অনেকদিন বাদে দাদুর আবার তার সঙ্গে সাংকেতিক চিঠি পাঠানোর খেলা খেলতে ইচ্ছে হয়েছে? এইসব ভাবতে-ভাবতে আজ ল্যাবরেটরিতে একটু অন্যমনস্কই ছিল নয়ন।

এই মহীদাদু হলেন নয়নদের পরিবারের সবচেয়ে প্রবীণ মানুষ। ওঁর বয়স এখন প্রায় চারশো বছর। ওঁর থেকে গুনলে নয়ন হল ঠিক ছ'নম্বর প্রজন্ম। মহীদাদু ছাড়া নয়নের আরও তিনজন দাদু ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন মারা গিয়েছেন। বাকি দু'জনের মধ্যে একজনের বয়স দুশো ছাড়িয়েছে। আর-একজন তিনশোর একটু বেশি। আসলে এই সৌরজগতে মানুষের দুশো-তিনশো বছর বেঁচে থাকাটা এখন কোনও ব্যাপারই নয়। নয়ন শুনেছে, একসময় পৃথিবীতে অসুস্থ হয়েই নাকি বহু মানুষ মারা যেত। কিন্তু এখন সব অসুখেরই ওষুধ বেরিয়ে গিয়েছে। তাই অসুস্থ হলেও সেরে উঠতে সময় লাগে না। তা ছাড়া বয়স বাড়লে শরীরের কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যদি দুর্বল হয়ে যায়, তা হলে সেটাও বদলে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

মানুষের নিজের শরীরের কোষ থেকেই ক্লোন করে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এখন গবেষণাগারে তৈরি করা যায়। অকেজো অঙ্গ বাদ দিয়ে নতুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এমনকী, কেউ যদি চায় বয়স্ক মানুষের কুঁচকে যাওয়া চামড়া বদলে নতুন চামড়া লাগিয়ে নেবে, তা হলে তাও করা যায় অনায়াসেই। নয়ন জানে আগে বয়স বাড়লে মুখে ভাঁজ পড়ত, চোখের জ্যোতি কমে আসত, অনেকে কানেও কম শুনত। তা ছাড়া হাঁটা-চলাতেও নাকি কষ্ট হত বেশ। এখন সেসবের বালাই নেই মোটেই। কার যে কত বয়স দেখে বোঝার কোনও উপায়ই নেই। সবাই বেশ সুস্থ, টগবগে, চনমনে।

আলাদা রকম মানুষ যে একেবারে নেই তা অবশ্য বলা যায় না। নয়নের মহীদাদুই বেশ একটু অন্য রকম। মহীদাদুকে দেখলে বোঝা যায় যে, তাঁর অনেক বয়স হয়েছে। কারণ বাইরের চেহারাটা খুব বেশি বদলাতে তিনি রাজি হননি। শরীরকে সুস্থ আর সক্ষম রাখার জন্য যেটুকু করা দরকার সেটুকুই করেছেন। মজার ব্যাপার হল এই কথাগুলো সবই নয়ন শুনেছে। সে যখন মহীদাদুর বাড়িতে গিয়ে থেকেছিল, তখন দাদুকে তার বুড়োমানুষ বলেই মনে হত। কিন্তু তখন তার দাদুর এইসব ইচ্ছে-অনিচ্ছে বোঝার মতো বয়স ছিল না। তারপর, মানে গত বাইশ বছরে নয়নের সঙ্গে দাদুর আর দেখা হয়নি।

দেখা হওয়ার মতো পরিস্থিতি যে হয়নি, তা কিন্তু নয়। এখন সবাই নিজেদের পরিবার বা ফ্যামিলি ট্রি নিয়ে খুব সচেতন। আত্মীয়স্বজনরা পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। নিজের কাজের জন্য যে-কেউ যেখানে খুশি থাকতে পারে। যেখানে খুশি যেতেও পারে। সেসবে কোনও রকম নিয়ম-কানুন কিছু নেই। সব মানুষই এই সৌরজগতের নাগরিক। তা ছাড়া সকলেরই প্রায় সুপারসনিক কার আছে। সেগুলো

জল-মাটি-কিংবা আকাশ, তিন জায়গায়ই সমান জোরে চলতে পারে। দরকারও হয়। কারণ, এখন তো সমুদ্রের নীচে ছোট-ছোট কলোনি তৈরি হয়েছে। সেখানে অনেক মানুষ থাকে। চাঁদে যাতায়াত তো অনেকদিন ধরেই আছে। গত একশো বছরে কাছাকাছি গ্রহগুলোতেও থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। তবু কোনও একটা ফ্যামিলি গেটটুগেদার হবে, খবর পেলে সবাই কিন্তু আসার চেষ্টা করে।

নয়নদের পরিবারে প্রতি দশ বছরে এরকম একটা করে গেটটুগেদার হয়। মহীদাদু কিন্তু গত দুটো এরকম গেটটুগেদারেই আসেননি। কেন আসেননি, সেটা অবশ্য নয়ন ঠিক জানে না। ব্যাপারটা নিয়ে সে খুব একটা মাথাও ঘামায়নি। কারণ ইচ্ছে থাকলেও সবাই যে আসতে পারবেই তা তো আর নয়। তবে দ্বিতীয় যে গেটটুগেদারটা হয়েছিল, তাতে সবাই ধরে নিয়েছিল মহীদাদু নিশ্চয়ই আসবেন। কারণ তার কিছুদিন আগেই নয়নের সোনাদাদু মারা গিয়েছিলেন। তাঁর স্মৃতিচারণার জন্য একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান ছিল। মহীদাদু যেহেতু সকলের চেয়ে বড়, তাই সেই অনুষ্ঠানে তাঁর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও ছিল। কিন্তু দাদু কিংবা দিদা কেউই সেদিন আসেননি।

সোনাদাদুর মারা যাওয়ার খবরটা শুনে নয়ন নিজে কিন্তু বেশ একটু অবাক হয়েছিল। সোনাদাদুর বয়স মোটেই বেশি নয়, মাত্র দেড়শো বছর। স্বাস্থ্য, চেহারা সবই চমৎকার। অথচ হঠাৎ একদিন তাঁর হৃৎপিণ্ড কাজ করা বন্ধ করে দিল। এই ব্যাপারটা একটু অদ্ভুতই লাগে নয়নের। রোগবালাই নেই, শরীরের কলকবজাও সব ঠিক আছে, তবু মানুষ অমর নয়। কে, কখন মারা যাবে কেউ জানে না। কেন হৃৎপিণ্ড এভাবে হঠাৎ কাজ বন্ধ করে দেয়, সেটাও কেউ জানে না। জানার চেষ্টাও হয় না। সবাই এটাকে খুব স্বাভাবিকভাবেই মেনে নেয়। বিজ্ঞানীরা এর কারণ খুঁজে বের করার জন্য কোনও চেষ্টা করছেন বলেও নয়ন শোনেনি। অন্যদের না লাগলেও তার কিন্তু ব্যাপারটা একটু অদ্ভুতই মনে হয়।

মহীদাদুর কথা ভাবতে-ভাবতেই এসব নানা চিন্তা ঢুঁ মারছিল নয়নের মনে। আসলে গত বাইশ বছর যে মানুষটার সঙ্গে দেখা হয়নি, তিনি কেন হঠাৎ তার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, সেই প্রশ্নটা ভাবাচ্ছিল নয়নকে। তবে ইতিমধ্যে সময় বেশ খানিকটা গড়িয়ে গিয়েছে। বাড়িতে নয়নের নিজস্ব কিছু কাজও আছে। তাই আর বেশি ভাবাভাবির মধ্যে না গিয়ে সরাসরি মনোবাহীতে দাদুর সঙ্গে যোগাযোগ করে নেওয়াই ঠিক হবে ভাবল নয়ন। সে যখন অফিসে ছিল, তখন দাদু মনোবাহীতে যোগাযোগ করলেও বিশেষ কিছু বলেননি। আসলে নয়ন কাজ করে একটা বাচ্চাদের ওষুধ তৈরির ল্যাবরেটরিতে। সেটা সারা পৃথিবীর মধ্যেই একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ল্যাবরেটরি। অফিসের কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যাতে বাইরে চলে না যায়, সেজন্য বিশেষ ধরনের স্ক্যানার বসানো আছে। মনোবাহীতে কথা বললেও সেটা সেই স্ক্যানারে ধরা পড়ে।

নয়ন ইতিহাসে পড়েছে, একসময় মানুষ পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার জন্য টেলিফোন নামের একটা যন্ত্র ব্যবহার করত। সেগুলোতে নাকি তারের ভিতর দিয়ে কথাবার্তা শোনার ব্যবস্থা ছিল। পরে অবশ্য তার উঠে যায়। তখন যোগাযোগ হত স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। এখন অবশ্য সেসব ঝামেলা নেই। বিজ্ঞানীরা এমন একটা তরঙ্গ আবিষ্কার করেছেন, যেটা দিয়ে একজন আর-একজনের সঙ্গে মনে-মনেই কথা বলে নিতে পারে। তবে গুরুত্বপূর্ণ সব অফিসেই মনোবাহীর স্ক্যানার আছে। সেখানে এই কথাবার্তার তরঙ্গকে মনিটর করা যায়। দাদু হয়তো এমন কিছু নয়নকে বলতে চাইছেন, যেটা অন্য কেউ জানুক তিনি চান না। তাই তখন বলেননি। যদিও দাদুর এরকম কী কথা থাকতে পারে সে বিষয়ে নয়নের কোনও ধারণাই নেই, তবু একটু সাবধান হওয়ার জন্যই নয়ন রিমোট টিপে ভোলুকে অফ করে দেয়। তারপর মনোবাহীতে দাদুর সঙ্গে যোগাযোগ করে।

যোগাযোগ করে অবশ্য লাভ হয় না বিশেষ। কারণ মহীদাদু মনোবাহীতেও কিছু খুলে বলতে রাজি নন। তাঁর কথা শোনার জন্য নয়নকে যেতে হবে তাঁর বাড়িতে। সেখানে গিয়ে অন্তত একটা দিন থাকতেও হবে। বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর ঠিক হয় পরের শনিবার নয়ন যাবে মহীদাদুর বাড়ি। জুরান্তি নামের একটা উঁচু টিলার উপর মহীদাদুর বাড়ি। নয়নের সাড়ে তিনশোতলা ফ্ল্যাটের গ্যাংওয়ে থেকে সুপারসনিক কার নিয়ে রওনা দিলে প্রায় এক ঘণ্টার পথ।

শনিবার অফিসে ছুটি থাকে নয়নের। তার অভ্যেস হল, ছুটির দিনে নিজের সুপারসনিক গাড়ি নিয়ে ইচ্ছেমতো বেরিয়ে পড়া। আকাশে ঘোরাটাই সুবিধে। কারণ কিছু বড় শহর ছাড়া পৃথিবীর অধিকাংশ জায়গাই এখন মস্ত-মস্ত গাছে ঢাকা জঙ্গল। নয়ন শুনেছে একসময় নাকি মানুষ এত বেশি গাছ কেটে ফেলেছিল যে, বাতাস আস্তে-আস্তে দূষিত হয়ে যাচ্ছিল। ওজোন স্তরেও নাকি ফুটো হয়ে গিয়েছিল। বিপদ বুঝে সতর্ক হয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। বেশি-বেশি করে গাছ লাগানো শুরু হয় তখনই। একটা অসুবিধে অবশ্য ছিল। তখন মানুষকে চাষআবাদ করে ফসল ফলিয়ে খেতে হত। তার জন্য অনেক-অনেক জমি লাগত। তারপর একসময় যখন গাছের সবুজ পাতা কী করে জল, অক্সিজেন আর কার্বন ডাইঅক্সাইড দিয়ে খাবার তৈরি করে সেটা জানা হয়ে গেল, তখন আর চাষের দরকার থাকল না। ফল, মূল, আনাজপাতি সবই এখন কারখানায় তৈরি হয়। চাষের জমিগুলোতে অনেক-অনেক গাছ লাগিয়ে জঙ্গল তৈরি করে ফেলা হয়েছে। পৃথিবীর বাতাস তাই এখন খুব পরিষ্কার। দূষণ নেই মোটেই।

এইসব ফাঁকা জমিতে তৈরি করা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেই নয়নের খুব ভাল লাগে। কত রকম গাছ, পাখি, প্রজাপতি দেখা যায়। বনে অনেক রকম হিংস্র জন্তু-জানোয়ার আছে ঠিকই, কিন্তু তা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। বাড়ি থেকে বেরনোর সময় নয়ন শুধু তার হলুদ রংয়ের অ্যান্টি-অ্যানিম্যাল বেল্টটা পরে নেয়। এটা পরা থাকলে কোনও ধরনের জন্তু-জানোয়ার, সাপ কিংবা বিষাক্ত পোকা কিছুই নয়নের শরীরের কুড়ি হাতের মধ্যে আসতে পারবে না। এরকমভাবে জঙ্গলে ঘুরতে-ঘুরতেই নয়ন নানা রকম গাছের চারা, বীজ কুড়িয়ে এনে নিজের বারান্দার ছোট্ট বাগানে লাগিয়েছে।

সবগুলো যে বেঁচেছে তা নয়। কিন্তু আবার কোনও-কোনওটাতে ফুল-ফলও ধরেছে। একটা লতানে গাছ যেমন এখনও নয়নের বারান্দায় দোল খায়। সেটাতে গাঢ় নীল রংয়ের ভারী সুন্দর প্রজাপতির মতো দেখতে ফুল ফোটে। নয়ন তার নাম জানত না। জানা সম্ভবও নয়। ফুল তো আর কোনও কাজে লাগে না। তাই ফুল নিয়ে এখন মানুষের কোনও আগ্রহও নেই। কিন্তু নয়ন ঠিক সেরকম নয়। ফুল-পাতা-পাখি এসব তার ভাল লাগে। সে নিজেই নানাভাবে খোঁজখবর করে জানতে পেরেছে যে, ফুলটার নাম অপরাজিতা। মাঝে-মাঝে বারান্দায় গিয়ে সে আপনমনেই “অপরাজিতা, অপরাজিতা...” বলে ডাকে। তার মনে হয় ফুলটাও যেন তার ডাকে সাড়া দিচ্ছে। ফুলের নাম আর গাছগুলো সে ভোলুকে চিনিয়ে দিয়েছে। সেগুলোর যত্ন করার দায়িত্ব ভোলুর। ভোলু অবশ্য ফুল চেনে না। তার কম্পিউটারে যেসব তথ্য স্টোর করা আছে, তাতে ফুল নেই। তবে নয়ন তাকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছে সেটা সে ঠিকঠাকই করে।

নয়ন নিজে জানে যে তার এইসব অভ্যেস অন্যদের চোখে বেশ অদ্ভুত ঠেকে। তার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন কিংবা অফিসের সহকর্মী কেউই এরকম ছুটির দিনে জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। তার মানে এই নয় কিন্তু যে তারা ছুটি পেলে আনন্দ করে না কিংবা বেড়াতে যায় না। সরকার থেকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিশাল-বিশাল পার্ক তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। তার কোনওটা বরফের দেশ, কোনওটা পাহাড়, কোনওটা এমনকী সমুদ্রও। সবই কৃত্রিমভাবে বানানো। কিন্তু দেখতে একেবারে আসলের মতো। সমুদ্রের পার্কে গেলে মনে হবে সত্যিই যেন সমুদ্রের তলায় চলে গিয়েছে। বরফের দেশে ছানাপোনা সমেত পেঙ্গুইন এসে পাশে বসবে। সেখানে থাকা-খাওয়া, আরও নানা রকম মজার ব্যবস্থা আছে। নয়নের

পরিচিতরা সবাই এরকম পার্কে বেড়াতে যায়। কিন্তু নয়নের কেন যেন পছন্দ হয় না। তার ইচ্ছে করে সত্যিকারের সমুদ্রের ঢেউ দেখতে, মরুভূমির গরম বালিতে পা ডুবিয়ে হাঁটতে। যদিও লোকে পাগল ভাবতে পারে ভেবে সে নিজের এইসব ইচ্ছে নিয়ে কখনও অন্য কারও সঙ্গে আলোচনাও করে না।

মহীদাদুর বাড়ি যেতে হবে। তাই এই শনিবার নয়নের আর অভ্যেসমতো জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়া হল না। সকালে উঠে, ভোলুর বানানো একটা দারুণ স্বাদের মাখন আর চকোলেট মাখানো স্যান্ডউইচ খেয়ে সে রওনা দিল জুরান্তির দিকে। সেদিন মহীদাদুর সঙ্গে কথা বলার সময় যেহেতু ভোলুকে সুইচড অফ করে দিয়েছিল, তাই তার আজকের যাওয়ার ব্যাপারেও ভোলু কিছু জানে না। জানানোর ইচ্ছেও ছিল না নয়নের। তাই খাওয়া হয়ে গেলে সে ভোলুকে অফ করে দিয়ে জামাকাপড় পরল। তারপর ভোলুর সুইচটাতে টাইমার সেট করে দিল। এটার সুবিধে হচ্ছে, নয়ন টাইমারে যে-সময়টা সেট করে দেবে, ভোলুর সুইচ ঠিক সেই সময় নিজে থেকেই অন হয়ে যাবে। তা হলে ভোলু ঘরের কাজকর্ম সবই করে রাখতে পারবে। কিন্তু নয়ন কোথায় বেরিয়েছে, কখন বেরিয়েছে এসবের কোনও স্মৃতিই তার থাকবে না।

এতসব কাণ্ড করে ঘর থেকে বেরনোর সময় অবশ্য নয়নের একটু হাসিই পাচ্ছিল। মহীদাদুর সামান্য একটা মজা করে লেখা চিঠি নিয়ে সে কত কিছু ভাবছে। আসলে তো যা হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, সেটা হল মহীদাদু অনেক দিন নয়নকে দেখেননি। দেখতে ইচ্ছে করছে। তাই এমন কায়দা করেছেন যাতে নয়ন কোনও অজুহাত দেখিয়েই যাওয়াটা বানচাল করতে না পারে।

নিজের সুপারসনিক গাড়িটায় উঠে, নয়ন সামনের ছোট ট্রে-টাতে চার-পাঁচটা অপরাজিতা ফুল রাখল। এগুলো সে মহীদাদুর জন্য নিয়েছে। মহীদাদু যে ফুল ভালবাসেন, সেটা নয়নের মনে আছে। ছেলেবেলায় যখন দাদুর বাড়িতে ছিল তখন দাদু তাকে নানা রকম ফুলের কথা বলেছিলেন। ফুলগুলোর কী সব যেন নাম বলতেন দাদু... ভাবতে-ভাবতেই নয়ন চারপাশটা দেখছিল। আজ দিনটা ভারী সুন্দর। চারদিকে ঝকঝক করছে সূর্যের আলো। আকাশের রংটাও চমৎকার একটা সোনালি আভা মেশানো নীল। সারা আকাশ জুড়ে বিভিন্ন স্তরে ছুটে চলেছে নানা ধরনের সুপারসনিক গাড়ি। কোন গাড়ি কোন রুটে, কত দূর যাবে, তার উপর নির্ভর করে গাড়িটা আকাশের ঠিক কোন লেভেলে থাকবে। এই সুপারসনিক গাড়িগুলো সবই খুব উজ্জ্বল রংয়ের। কোনওটা টুকটুকে লাল, কোনওটা গাঢ় কমলা কিংবা গোলাপি কিংবা একেবারে ঝকঝকে সবুজ। দেখতে-দেখতে নয়নের মনে হচ্ছিল আকাশটা যেন একটা নীল গাছের জঙ্গল। আর সেই জঙ্গলে ফুটে আছে নানা রংয়ের ফুল।

প্রায় এক ঘণ্টা চলার পর নয়ন দূর থেকে জুরান্তি পাহাড়টা দেখতে পেল। ঘন জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়। তার ঠিক মাথায় মহীদাদুর লাল-সাদা রংয়ের বাড়ি। নয়ন যখন ছেলেবেলায় দাদুর কাছে ছিল, তখন কিন্তু তিনি এখানে থাকতেন না। মুম্বই শহরে সমুদ্রের ধারে একটা মস্ত বাংলো ছিল তাঁর। সেখানে থাকার সময় প্রায় রোজই খুব ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দাদুর হাত ধরে সে সমুদ্রের ধারে চলে যেত। লাল টুকটুকে বলের মতো সূর্যকে সমুদ্রের জল থেকে একলাফে আকাশে উঠতে দেখে ভারী মজা লাগত নয়নের। তারপর কবে যে মহীদাদু সেই সমুদ্রের ধারের বাড়িটা ছেড়ে পাহাড়ের মাথায় উঠে বসলেন সেটা নয়নের ঠিক জানা নেই। তবে মায়ের কাছে একবার ভাসা-ভাসা শুনেছিল যে, মহীদাদুর সঙ্গে নাকি সরকারের কোনও একটা গন্ডগোল হয়েছিল। মহীদাদু পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাগারের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। কিন্তু সমস্যা হওয়ায় তিনি কাজটা ছেড়ে দেন। নয়নের কেমন যেন মনে হল, তারপরই হয়তো নিজেকে সবকিছু থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মহীদাদু এই পাহাড়ের উপর এসে থানা গেড়েছেন।

জুরান্তিকে ঠিক পাহাড় বলা চলে না, টিলা বলাই ভাল। তার উপরটা সমতল। সেখানেই দাদুর বাড়িটা। চারপাশে অনেকখানি খোলা জায়গা। একপাশে সুপারসনিক কার নামার জন্য একটা হ্যাঙারও রয়েছে। নয়ন চারপাশের উঁচু-উঁচু গাছগুলোকে এড়িয়ে সেই হ্যাঙারে এনে গাড়িটা নামাল। এই গাড়িগুলোর একটা সুবিধে হচ্ছে এগুলো একটা বিশেষ ধরনের নমনীয় জিনিস দিয়ে তৈরি। সেজন্য ইঞ্জিন বন্ধ করার পর একটা বোতাম টিপে দিলে গাড়িটা গুটিয়ে ভাঁজ হয়ে যায়। তখন সেটাকে একটা ছোট্ট বাক্সের মধ্যে ভরে রাখতেও অসুবিধে হয় না। গাড়ির শব্দ পেয়ে বাড়ির ভিতর থেকে মহীদাদুর স্ত্রী মানে, নয়নের ঠাকুরমা বেরিয়ে এসেছিলেন। নরম চেহারার মানুষটি। তবে মুখের ভাঁজে আর চোখের দৃষ্টিতে দৃঢ়তার ছাপ আছে। নয়নকে দেখেই তার মুখে একটা ভারী স্নেহের হাসি ফুটল।

"আয় দাদুভাই। আমরা সকাল থেকে তোর জন্য অপেক্ষা করছি। তোর দাদু তো অস্থির হয়ে উঠেছে।"

ড্যাশবোর্ডের উপর থেকে অপরাজিতা ফুলগুলো নিয়ে ঠাকুরমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করল নয়ন। ততক্ষণে বাড়ির ভিতর থেকে আর-একজন বেরিয়ে এসেছে।

"নয়নের গাড়িটা তুলে রেখে দাও পিলু আর সামনের বাগানে আমাদের ব্রেকফাস্ট দাও।"

ঠাকুরমার কথায় মাথা নেড়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল পিলু। তার শক্তপোক্ত চেহারা, আর জামার কাঁধে লাগানো হলুদ রংয়ের বোতাম দেখে নয়ন বুঝতে পারল পিলু হচ্ছে একেবারে স্পেশ্যাল ক্যাটিগরির রোবট। এই ধরনের রোবটের দাম খুব বেশি। এরা শুধু, যে-কোনও ধরনের হুকুম তামিল করতে পারে তাই নয়, প্রয়োজনে নিজেদের মতো করে কিছু সিদ্ধান্তও নিতে পারে। যেমন মালিক যদি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তার কিছু বলার ক্ষমতা না থাকে তা হলে এইসব স্পেশ্যাল ক্যাটিগরির রোবট নিজেই ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে

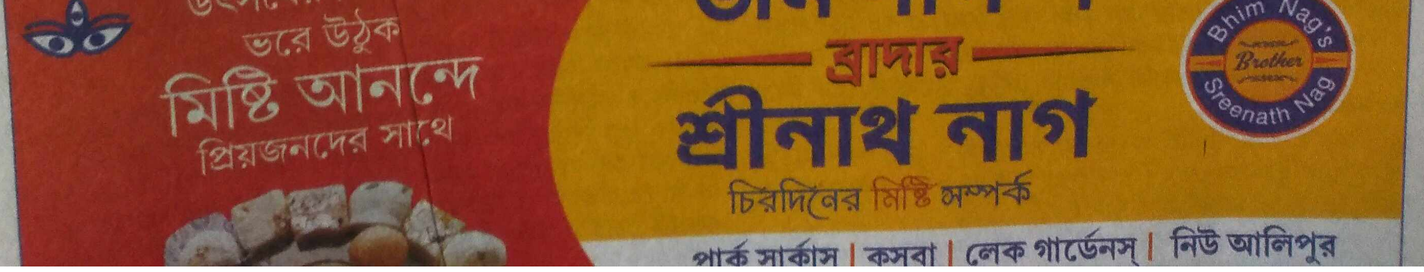
উৎসবের দিনগুলি
ভরে উঠুক
মিষ্টি আনন্দে
প্রিয়জনদের সাথে

ভীম নাগ'স
ব্রাদার
শ্রীনাথ নাগ
চিরদিনের মিষ্টি সম্পর্ক

Bhim Nag's Brother Sreenath Nag

পার্ক সার্কাস | কসবা | লেক গার্ডেনস্ | নিউ আলিপুর

হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারবে। তার মানে এই নয় অবশ্য যে, এদের চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা আছে। কিছু-কিছু বিশেষ পরিস্থিতি এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রোগ্রাম করে তাদের সিস্টেমে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সেইসব ক্ষেত্রে তারা এরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারে। নয়নের মনে হল জুরান্তির মতো এরকম একটা বিজন জায়গায় থাকেন বলেই সম্ভবত মহীদাদু এত দামি রোবট নিজের বাড়িতে রেখেছেন।

তবে একটা জিনিস লক্ষ করে সে একটু আশ্চর্যই হল, পিলু যেখানে তার সুপারসনিক কারটা ভাঁজ করে তুলে রাখল, সেখানে আর কোনও গাড়ি নেই। মহীদাদু কি সুপারসনিক কার ব্যবহার করেন না? তা হলে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন কীভাবে? কথাটা ভাবতে-ভাবতেই লম্বাটে একটা করিডর আর তারপর বেশ সাজানোগোছানো ড্রইংরুম, বারান্দা পেরিয়ে ঠাকুরমার সঙ্গে নয়ন পৌঁছে গেল সামনের বাগানে।

পাহাড়ের গায়ে রোদে ভাসাভাসি একটা খোলা জায়গা। চারপাশে অজস্র নানা রংয়ের ফুলের গাছ। মাঝখানে একটা সাদা রং করা ডিম্বাকৃতি বেতের টেবিলের চারপাশে চারটি সাদা চেয়ার। লাল চেককাটা টেবিল ক্লথের উপর টিকোজ়ি ঢাকা টিপট আর কাপডিশ রাখা। একটা সাদা প্লেটে বেশ কয়েক রকমের বিস্কুট। বিস্কুটের গুঁড়ো পড়ে আছে ঘাসেও। সেগুলো খুঁটে-খুঁটে খেতে ব্যস্ত দু'-তিন রকমের ছোট-ছোট পাখি। কিন্তু আর কেউ কোথাও নেই।

"ওমা, তোর দাদু কোথায় গেল রে?"

ঠাকুরমার কথা শুনে ভারী অবাক হয়ে নয়ন সবে একটা কিছু বলতে যাচ্ছে, এমন সময় পিছন থেকে তার চোখের উপর হাত চাপা দিয়ে কে যেন বলে উঠল, "বলো দেখি আমি কে?"

খুব মজা লাগল নয়নের। ছেলেবেলায় এই খেলাটা সে প্রায়ই দাদুর সঙ্গে খেলত। কচি-কচি দুই হাত দিয়ে পিছন থেকে দাদুর চোখ দুটো চেপে ধরে বলত, "বলো তো আমি কে?"

আর দাদু ভান করতেন যেন নয়নকে চিনতেই পারছেন না। নানা রকম উলটোপালটা নাম বলতে-বলতে শেষ পর্যন্ত যখন বলে উঠত, "বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি এটা নিশ্চয়ই গজা," তখন হো হো করে হেসে চোখ ছেড়ে দিত নয়ন। আসলে দাদুর পোষা কুকুরের নাম ছিল গজা। দাদু তাকে গজা ভাবছে দেখে ছোট্ট নয়নের হাসি যেন আর থামত না। কথাগুলো মনে পড়ে যেতেই মনটা খুশি-খুশি হয়ে গেল নয়নের। চোখের উপর রাখা হাতের কুঁচকে যাওয়া চামড়ায় হাত বুলিয়ে বলে উঠল, "কই বুঝতে পারছি না তো... তুমি নিশ্চয়ই গজা..."

হেসে উঠে চোখ ছেড়ে দিয়ে মহীদাদু বলে উঠলেন, "নাহ, তোর দেখছি সবই মনে আছে।"

"আসলে মনে ছিল না জান তো। তুমি যেই ওরকম করলে অমনি মনে পড়ে গেল।"

নয়নের কথা শুনে চেয়ারে বসতে-বসতে মাথা নেড়ে মহীদাদু বললেন, "ঠিকই বলেছিস। আসলে মানুষের মন ভারী অদ্ভুত, বড় জটিল। স্মৃতির গুহায় অনেক কিছু জমা থাকে, ঘুমিয়ে থাকে। কখন যে কোনটা জেগে উঠবে, কী কারণে জেগে উঠবে সেটা বলা মোটেই সম্ভব নয়। এই যে তোর আমার চোখ চেপে ধরার ঘটনাটা মনে পড়ে গেল, এটাও নাই মনে পড়তে পারত। আবার এর আশপাশে অনেক ঘটনা ঘটেছিল, যেটা তোর মনে নেই। সেটা কিন্তু এখনও মনে পড়ল না। খুব ইন্টারেস্টিং... হিউম্যান ব্রেন আমাকে চিরকালই ভীষণ টানে।"

"কিন্তু তুমি তো, আমি যত দূর জানি, হিউম্যান ব্রেন নিয়ে কাজকর্ম করোনি।"

"না, তা ঠিক করিনি। আবার বলতে পারিস যা নিয়ে কাজ করেছি তার সঙ্গে হিউম্যান ব্রেনের সম্পর্ক যে নেই তাও ঠিক বলা চলে না। আসলে আমার মাঝে-মাঝে মনে হয়..."

কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই মহীদাদু হঠাৎ নয়নের হাতের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "তোর হাতে কী রে নয়ন?"

"ফুল। আমার বারান্দার বাগানে ফুটেছে। তোমার জন্য নিয়ে এলাম।"

"নাম জানিস এই ফুলের?"

"হ্যাঁ জানি, অনেক কষ্টে, পুরনোদিনের ইনফরমেশন ঘেঁটে বের করেছি। অপরাজিতা। এটা নাকি সাদা-নীল দু'রকম রংয়ের হয়। আমি অবশ্য সাদাটা কোনওদিন দেখিনি। জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে ফুলটা দেখে খুব ভাল লেগেছিল। তাই চারা তুলে এনে টবে লাগিয়েছিলাম। আমার রোবট ভোলুকে যত্ন করা শিখিয়ে দিয়েছি। এখন দিব্যি ফুল ফুটছে। তবে বর্ষায় বেশি ফুল ফোটে। এখন ফুল কমে এসেছে।"

কথাগুলো বলতে-বলতে নয়ন লক্ষ করল মহীদাদু কেমন যেন একটা অদ্ভুতভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। নয়নের কথা শেষ হতে, তিনি একটু হেসে ঠাকুরমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল তাই না?"

দাদু কেন নিশ্চিন্ত হলেন সেটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল নয়ন, কিন্তু তার আগেই বিশাল একটা ঢাকা দেওয়া ট্রে-তে করে ব্রেকফাস্ট নিয়ে হাজির হল পিলু। নয়নের দিকে তাকিয়ে বেশ শান্ত কিন্তু গম্ভীর গলায় বলল, "ঠাকুরমা বলেছেন আপনার জন্য আগেকার দিনের মতো জলখাবার তৈরি করে দিতে। আমি সেরকমই চেষ্টা করেছি। সব কিছু আমার প্রোগ্রামে ছিল না। কিন্তু ঠাকুরমা দেখিয়ে দিয়েছেন। আশা করি আপনার ভাল লাগবে।"

"আমি কিন্তু তোমাকে তুমি করে বলব পিলু। তুমিও আমাকে তাই বোলো।"

"বেশ তো। অতিথি যেমন চাইবে আমি সেভাবেই কথা বলব। কিন্তু তুমি কি জানতে চাও আমি কী রান্না করেছি?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই..."

"আমি তোমার জন্য বানিয়েছি সাদা-সাদা ফুলকো লুচি। সঙ্গে তোমার দাদুর বাগানের আলু, ফুলকপি আর মটরশুঁটি দিয়ে তরকারি। তাতে একটু টোম্যাটো আর ধনেপাতাও দিয়েছি। সঙ্গে নরম তুলতুলে বেগুন ভাজা আর নতুন গুড়ের পায়েস।"

"ওহ পিলু, আমার তো শুনেই জিভে জল এসে যাচ্ছে। আমার জন্য এত পরিশ্রম করেছ তুমি...অনেক ধন্যবাদ!"

"তুমি খুশি হলেই আমার পরিশ্রম সার্থক। তোমাদের সকলের দিন শুভ হোক।"

পিলু চলে যাওয়ার পর ট্রে-র ঢাকা সরিয়ে লুচির প্লেট নিয়ে খেতে-খেতে নয়ন বলল, "এত রকম আয়োজন তুমি করলে কী করে দাদু?"

"এতেই ঘাবড়ে যাস না, দুপুরের খাবারেও নানা রকম চমক আছে।"

"সে তো বুঝলাম। তোমার বাগানে ফুলকপি, কড়াইশুঁটি হয় তাও পিলুর কথায় বুঝলাম। কিন্তু বাকি জিনিসপত্র তুমি পাও কী করে? সুপারসনিক কার না থাকলে এখান থেকে কোথাও যাওয়া-আসা করাই তো বেশ মুশকিল।"

"কার যে নেই সেটা তার মানে তুই খেয়াল করেছিস। খুব ভাল, খুব ভাল। আসলে কী বল তো নয়ন, বুড়োমানুষদের খুব বেশি জিনিসের প্রয়োজন হয় না। আমার বাগানে অনেক কিছুই হয়। বাকি যা লাগে সবই বললে দিয়ে যায়।"

"কারা দিয়ে যায়?"

"আসলে আমি তো সরকারি কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পর জুরান্তিতে এসেছি। সরকারের সঙ্গে আমার চুক্তিই আছে, আমার যা লাগবে ওরা দিয়ে যাবে। কোথাও যেতে চাইলেও ওরা নিয়ে যাবে। তাই সুপারসনিক কারের দরকার হয় না। এই তো, তুই আসবি বলে যা-যা চেয়েছিলাম সবই কাল সকালে দিয়ে গিয়েছে। আর তারপর থেকেই তোর ঠাকুরমা পিলুকে নিয়ে লেগে পড়েছে। চারশো বছর বয়স হতে চলল, এখনও বুড়ি রান্না করতে পারলে আর কিছু চায় না!"

কথাটা বলে হোহো করে হেসে উঠলেন মহীদাদু। কিন্তু কেন যেন

নয়নের মনে হল দাদুর হাসিটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। দাদু যেন কোনও একটা কথা চাপা দেওয়ার জন্য ওরকম গলা তুলে হাসছেন।

ব্রেকফাস্ট খাওয়া হল দিব্যি জম্পেশ করে। খাওয়া শেষ হওয়ার পর পিলু যখন ট্রে-তে বাসনপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে, তখন আরাম করে চায়ে চুমুক দিয়ে নয়ন বলল, “হ্যাঁ, দাদু , তা হলে এবার...”

সঙ্গে-সঙ্গে নয়নের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মহীদাদু বলে উঠলেন, “হ্যাঁ, আয় এবার আমাকে তোর সবজিবাগান আর পুষ্যিদের দেখাই। পুষ্যিরা অবশ্য আমার চেয়েও তোর ঠাকুরমার বেশি ন্যাওটা। দুটো কাঠবিড়ালি আছে, ওর হাত থেকে বাদাম না খেলে তাদের রীতিমতো গাল ফুলে যায়। আজ তুই আছিস বলে ব্যাটারা কাছে আসেনি। গাছের আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে। একদিন থাকলেই দেখবি তোর সঙ্গেও ভাব হয়ে গিয়েছে...”

কথাগুলো বলতে-বলতে মহীদাদু চেয়ার ছেড়ে উঠে বাগানের দিকে হাঁটা দিয়েছেন। নয়ন লক্ষ করল ঠাকুরমা চোখের ইশারায় নয়নকে দাদুর সঙ্গে যেতে বলছেন। ঠাকুরমার কথা মেনে সেও বাগানের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে শুনতে পেল ঠাকুরমা পিলুকে বলছেন, “আজ দুপুরেও কিন্তু বেশ কয়েক রকম নতুন রান্না হবে পিলু। আমি বরং এখনই রান্নাঘরে গিয়ে তোমাকে সবটা বুঝিয়ে বলে দিই।”

হাঁটতে-হাঁটতে মহীদাদু এসে দাঁড়ালেন বাগানের একেবারে প্রান্তে। কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে নেমে গিয়েছে ঘন জঙ্গলে ঢাকা গভীর খাদ। দূরে-দূরে দেখা যাচ্ছে নীল-নীল পাহাড়ের সারি। বেড়াটার গা বেয়ে লতিয়ে গিয়েছে কোনও একটা অজানা লতা। সেটা হালকা গোলাপি রংয়ের থোকা-থোকা ফুলে ভর্তি। একটা সবুজ রংয়ের পাখি বিদ্যুতের মতো সেই ফুলের ভিতর থেকে পোকা তুলে নিয়ে উড়ে চলে গেল। মহীদাদু একটু হেসে বললেন, “জানিস নয়ন, এই পাখিটাকে বলে বাঁশপাতি। কাছ থেকে দেখলে বুঝতে পারতিস, ওর চোখের নীচে একটা অদ্ভুত কালো দাগ আছে। দেখে মনে হয় যেন পাখিটা চোখে কাজল পরেছে।”

নয়ন একটু আশ্চর্য হয়ে বলল, “এই গাছপালা, ফুল, পাখি এসবই তুমি চেন? সবার নাম জান?”

“না, সব চিনি বলব না। তবে বেশির ভাগ চিনি। চারশো বছরের স্মৃতি তো নেহাত কম নয় রে ভাই। এক সময় স্বাভাবিকভাবেই অনেক কিছু চিনেছিলাম, জেনেছিলাম। তারপর একটা সময়ের পর থেকে, একদিকে চেষ্টা করতে লাগলাম জানা জিনিসগুলো যাতে ভুলে না যাই। অন্যদিকে প্রকৃতির এইসব সম্পদ যত বেশি সম্ভব যেন চিনে নিতে পারি।”

“কেন বলো তো, এসব তোমার কী কাজে লাগে?”

“আমার আর কী কাজে লাগবে! আমি তো এসব জেনে রেখেছি তোর জন্য। তুই তো ফুল, গাছ, পাখি এসব ভালবাসিস। নিজের চেষ্টাতেই তো অনেক কিছু জেনেছিস।”

“তা তো লাগে। কিন্তু সেটা তুমি জানলে কী করে? আমার এরকম শখের কথা তো আমার মাও জানে না।”

“কিন্তু আমি জানি। আমি জানতাম এরকমটাই হবে...”

দাদুর কথাবার্তা বেশ একটু বেখাপ্পা লাগে নয়নের। তার সন্দেহ হয়, মহীদাদুর মস্তিষ্কের কোষগুলো হয়তো একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি সেগুলো বদলে ফেলা দরকার। কিন্তু সে বিষয়ে কিছু বলার আগেই মহীদাদু একটু নিচু গলায় বলেন, “নয়ন তোকে কিছু খুব জরুরি কথা বলার জন্য আমি এখানে ডেকে এনেছি। কিন্তু কথাগুলো এখন বলা যাবে না। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর তুই তোর ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বি। কিন্তু ঘুমোস না। ঠিক বারোটার সময় আমি তোকে ডাকব।”

“কিন্তু অত রাতে, ওরকমভাবে আমরা কথা বলব কেন?” অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে নয়ন।

“কারণ তোকে যেটা আমি বলব, সেটা অত্যন্ত গোপন কথা। আমি আর তোর ঠাকুরমা ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ এটা জানে না। জানলে বিপদ হতে পারে। পিলু রোজ রাতে আমাদের একটা করে ঘুমের ওষুধ দেয়। আমরা সেটা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। তারপর রাত বারোটায় পিলু নিজে থেকে সুইচ্‌ড অফ হয়ে যায়। আমরা আবার ভোর পাঁচটায় উঠে ওকে অন করি। এই রুটিনের বাইরে যদি ওকে অফ বা অন করা হয় তা হলে সেটা রেকর্ড হয়। তাই আমি এটা ভাঙতে চাই না। আর আমি যে কথাগুলো তোকে বলব, সেগুলো কোনওভাবেই পিলুর সামনে বলা যাবে না। কারণ পিলু সাংঘাতিক অ্যালার্ট রোবট। আমাদের প্রতিটি মুভমেন্ট, কথাবার্তা সব ও মনিটর করে।”

“আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না দাদু। পিলু কেন মনিটর করে? পিলু অফ-অন হচ্ছে কি না, তার রেকর্ডই বা কে দেখে...”

“এখন এত কথা বলতে পারব না। কারণ আমাদের বাগান দেখতে যতটুকু সময় লাগা উচিত, সেটা প্রায় শেষ হয়ে এল। একটা জিনিস শুধু জেনে রাখ, যাদের জন্য আমি আজ সাধারণ জীবন থেকে বহু দূরে এই জুরান্তিতে নির্বাসিত, এসব তারাই করে।”

রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিল নয়ন। তবে ঘুমিয়ে পড়েনি। জেগে থাকার জন্য তাকে কোনও চেষ্টা করতে হচ্ছিল না। এমনিতেই সকালে দাদুর সঙ্গে কথাবার্তার পর মনটা একটা চাপা উদ্বেগে ভারী হয়ে আছে। তা ছাড়া নয়ন যেখানে থাকে তার থেকে এই জুরান্তির পরিবেশটা এতই আলাদা যে, সহজে ঘুম আসার কথা নয়। নয়নের সাড়ে তিনশোতলার অ্যাপার্টমেন্টটা একেবারে শহরের মধ্যে। সেখানে সারাক্ষণই নানা রকম আলো জ্বলে। রাত যে হয়েছে সেটা বোঝারই উপায় নেই। তা ছাড়া অনবরত হুশহাশ করে উড়ে যাচ্ছে রকমারি উড়ুক্কু যান। তাদের চলাচলের শব্দে কান এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে জুরান্তির চারপাশের এই ভীষণ নৈঃশব্দ্যে নয়নের মনে হচ্ছে কেমন যেন তার কানে তালা লেগে যাচ্ছে।

রাতের খাওয়া সেরে বাগানে একটু পায়চারি করতে গিয়েছিল।

INTER NATIONAL INSTITUTE OF FASHION DESIGN
INIFD
The Cradle of Designers
DISCOVER YOUR TALENT LEARN GROW
INIFD
SALTLAKE
ADMISSIONS OPEN
FASHION DESIGN
INTERIOR DESIGN
DD-7(3rd Floor), Salt Lake City, Near City Center 1, Next to ILS Hospital, Kolkata- 700064
(033) 4600 4650/51/52 / 7595076230 / 9051368234 / 7595060792 / 9883607738
www.facebook.com/inifdacademy.saltlake
Website: http://www.inifdkolkata.com/
INDIA • LONDON • NEW YORK • SINGAPORE • INDONESIA • LOS ANGELES

বেশ ঠান্ডা আছে। বাতাসে যেন ছুরির ধার। বেশিক্ষণ তাই থাকা যায়নি। কিন্তু তার মধ্যেও নয়নের মনে হচ্ছিল আকাশটা যেন একেবারে নীচে নেমে এসেছে। একটু চেষ্টা করলেই ঝকমকে হিরের ফুল বসানো কালো ভেলভেটের চাদরটাকে হাত দিয়ে ছোঁয়া যাবে। ভাল লাগছিল নয়নের। কিন্তু একটু পরেই পিলু এসে বলল, “বাইরের তাপমাত্রা খুবই কম। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়তে পার। ঘরে চলে এসো। তোমার রুম টেম্পারেচার কুড়ি ডিগ্রি করে দিয়েছি। আশা করি অসুবিধে হবে না। রাতে সুখনিদ্রা হবে।”

পিলুর পাছে কোনও রকম সন্দেহ হয়, তাই আর কথা না বাড়িয়ে ঘরে চলে এসেছিল নয়ন। মহীদাদু আর ঠাকুরমাও ততক্ষণে নিজেদের ঘরে চলে গিয়েছেন। পিলু তাকে ‘শুভরাত্রি’ জানিয়ে চলে যাওয়ার পর চুপচাপ বিছানায় শুয়ে অপেক্ষা করছিল। ঘড়িতে যখন ঠিক বারোটা পাঁচ, তখন দরজায় টুকটুক করে শব্দ হল। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে নয়ন দেখল ঠাকুরমা দাঁড়িয়ে আছেন, “আমাদের ঘরে আয়। ওখানে বসেই কথাবার্তা হবে। তোর দাদু অপেক্ষা করছে।”

মহীদাদুর শোওয়ার জানলা-দরজা সব বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বেশ ঠান্ডা। নয়ন বুঝতে পারে অন্য অনেক কিছুর মতোই এক্ষেত্রেও দাদু কৃত্রিমভাবে ঘরের তাপমাত্রা বাড়াননি। শীতের স্বাভাবিক পরিবেশটাই রাখতে চেয়েছেন। মস্ত একটা খাটে, পিছনে দুটো বালিশ দিয়ে আরাম করে বসেছিলেন দাদু। নয়নকে দেখে বললেন, “খাটে উঠে কম্বলের ভিতর ঢুকে বোস। না হলে শীত করবে। তোদের তো আবার এসব অভ্যেস নেই। শীত, গ্রীষ্ম কোনওকিছুর স্বাদ বোঝার ইচ্ছে নেই। ঘর মানে সারাক্ষণ ওই কুড়ি ডিগ্রি। আমার তো এই ব্যাপারটাই ভারী একঘেয়ে লাগে।”

“তোমরা কথাবার্তা বলতে শুরু করো। সারারাত তো আর জেগে থাকা যাবে না। ঘণ্টাখানেক অন্তত ঘুমোতে হবে। আমি বরং তিন কাপ কফি করে আনি।”

ঠাকুরমা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর মহীদাদু একটু সময় দু’ আঙুলে নিজের কপালটা টিপে বসে রইলেন। তারপর আস্তে-আস্তে চোখ খুলে নয়নের দিকে তাকিয়ে বললেন, “তোর নিশ্চয়ই পুরো ব্যাপারটাই ভারী অদ্ভুত লাগছে, তাই না নয়ন? ভাবছিস শেষ পর্যন্ত চারশো পেরিয়ে মহীদাদুকে ভীমরতিতে ধরল।”

“না, তা ভাবিনি মোটেই। তবে আশ্চর্য হয়েছি নিশ্চয়ই। বিশেষ করে তুমি যখন মনোবাহীতে আমাকে কোনও কথা না বলে এখানে আসতে বললে, তখন বেশ একটু অবাক হয়েছিলাম।”

“আমার কোনও উপায় ছিল না রে। কারণ আমি বুঝতে পারছি যে আমার হাতে আর বিশেষ সময় নেই। তাই কোনও ঝুঁকি না নিয়ে তোকে ডেকে পাঠিয়েছি।”

“তার মানে...কী বলছ তুমি...”

“ঠিকই বলছি। আমি জানি মানে বুঝতে পারছি যে, আমার দিন শেষ হয়ে আসছে। আর বেশিদিন বাঁচব না। তার আগে আমার কাজ আমাকে শেষ করে ফেলতে হবে।”

“এটা তুমি কী করে বলছ দাদু? আমরা জানি যে, কেউ অমর নয়। কিন্তু কে কবে মারা যাবে সেটা কি কেউ বলতে পারে? সে তো সেই আদিম যুগ থেকেই অজানা এক তথ্য।”

“সবাই পারে না। কিন্তু কেউ-কেউ পারে। আচ্ছা আমাকে একটা জিনিস বল, তুই তো জানিস যে পৃথিবীর লোকসংখ্যা এখন নির্দিষ্ট। তার বেশি বাড়ানো কিংবা কমানো যায় না। তার মানে প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার মানুষ জন্মায় এবং মারা যায়। এখন এটা যদি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে হয়, তা হলে এই সংখ্যাটার হেরফের হবেই। কখনও বেশি মানুষ জন্মাবে কিংবা কম মানুষ মরবে। কিংবা উলটোটা। কিন্তু সেটা হয় না। তার মানে ঠিক কতগুলো মানুষ মারা যাবে এবং কতজন জন্মাবে সেটা কেউ নিয়ন্ত্রণ করে। একদম অঙ্কের নিয়মেই এর পর বলা যায়, যারা এটা নিয়ন্ত্রণ করে, তারা নিশ্চয়ই জানে যে এবার কারা মারা যাবে। এই জটিল বিষয়টা নিয়ে তোর মনে কোনওদিন কোনও প্রশ্ন জাগেনি নয়ন?”

“একদম জাগেনি বলব না। ইনফ্যাক্ট আমার একটু আশ্চর্যই লাগে, এই যে কোনও এক অজানা কারণে একদিন হঠাৎ একটা মানুষ মারা যায়, সেই কারণটাকে কেন কেউ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে না? কেন বিজ্ঞানীরা এবিষয়ে এতটা উদাসীন!”

“চেষ্টা করে না, কারণ অধিকাংশ মানুষ এটা নিয়ে ভাবে না। ভাবার ক্ষমতাই তাদের নেই। কেন নেই সেকথাটা তোকে পরে বলছি। তবে কিছু লোক কিন্তু ভাবে। ভাবে বলা উচিত নয়, তারা ব্যাপারটা জানে। সেই বিজ্ঞানীরা মোটেই এ ব্যাপারে উদাসীন নন। বরং তাঁরাই ঠিক করেন যে, কারা মারা যাবে এবং কীভাবে মারা যাবে।

“কী সাংঘাতিক কথা! এরা কারা? এদের এরকম করার অধিকারই বা কে দিল?”

“এঁরা সবাই অতি উচ্চ পদমর্যাদার বিজ্ঞানী, ডাক্তার, প্রশাসক কিংবা অন্য কিছু। এঁরা একটি বিশেষ টিমের গোপন সদস্য। সমাজে বা পরিচিত মহলে এঁদের সকলেরই আলাদা পরিচয় আছে। কিন্তু তাঁরা যে এই কাজটা করে, সেটা খুব কম লোকেই জানে। এটাকে বলা হয় প্রজেক্ট। এর একটা বেশ গালভরা নামও আছে বুঝলি, পারফেক্ট ইউনিভার্স, সংক্ষেপে পিউ। পৃথিবীটাকে এখন বকলমে এঁরাই চালায়।”

“তুমি এত কথা জানলে কী করে?”

“আমিও তো এঁদের একজন মেম্বার।”

“তুমি এরকম একটা ভয়ানক প্রজেক্টের মেম্বার!”

মহীদাদুর কথায় সাংঘাতিক চমকে ওঠে নয়ন। তার দিকে তাকিয়ে একটু বিষণ্ণ হেসে মহীদাদু বলেন, “পারফেক্ট ইউনিভার্স মানে বুঝতে পারছিস তো? একটা নিখুঁত-সুন্দর পৃথিবী। সেরকমটা আর কে না চায় বল? তার পিছনে যে এরকম দানবীয় পরিকল্পনা থাকতে পারে, সেটা তো প্রথমে বুঝিনি। তবে এখন বোধ হয়, আমি পিউ-এর মেম্বার ‘ছিলাম’ বলাটাই ঠিক। কারণ অনেকদিন হল আমি আর ওঁদের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত নই। পিউ-এর সঙ্গে আমার কানেকশনের সব রাস্তাগুলোই ডিঅ্যাক্টিভেট করে দেওয়া হয়েছে। যদিও যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন খাতায়-কলমে মেম্বার থাকব। কারণ ওঁরা আমাকে লাইফটাইম মেম্বারশিপ দিয়েছিল। তবে সেটাও আর বেশিদিন নয়।”

“তুমি বারবার এই কথাটা বলছ কেন বলো তো দাদু?”

“বুঝতে পারলি না! আমি তো জানি রে দাদাভাই, পিউ যখন ঠিক করে নেয় কাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে, তারপর তাদের উপর কী কী করা হয়, কীভাবে পদ্ধতিটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, সেসবই তো আমার জানা। মানুষটা যখন ধীরে-ধীরে শেষ পরিণতির দিকে এগোয় তখন সেটা ঠিকঠাক চলছে কি না, বোঝার জন্য মনিটরিং হয়। পিউ-এর মেম্বাররা সেই মনিটরিংয়ে কী-কী লক্ষণ নোট করে তাও তো আমি জানি। তাই নিজের শরীরে সেই লক্ষণগুলো যখন ধীরে-ধীরে অনুভব করছি, তখন তো বুঝতেই পারছি যে হাতে সময় আর বেশি নেই।”

“এত কিছু বুঝতে পারছ, অথচ প্রতিবাদ করছ না? সেটা থেকে বেরিয়ে আসারও চেষ্টা করছ না?”

“প্রতিবাদ কার কাছে করব? কেউ তো আমার কথা বিশ্বাস করবে না। আর বেরিয়ে আসারও কোনও উপায় নেই।”

“কেন, উপায় নেই কেন?”

“কারণ আমি সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিন যে ওষুধগুলো খাই, তাতেই মেশানো হচ্ছে এমন একটা উপাদান যেটা খুব ধীরে-ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে কমিয়ে আনবে আমার জীবনীশক্তি। কোন ওষুধটায় কখন সেটা মেশানো হচ্ছে আমি জানি না। প্রতিটি ট্যাবলেট আমার পক্ষে পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব নয়। আমি সব ওষুধই খাওয়া বন্ধ করে দিতে পারি। তাতে একদম প্রাকৃতিক নিয়মে আমি কিছুদিনের মধ্যেই মারা যাব। আর যদি ওষুধ খেয়ে যাই তা হলে ওদের তৈরি করা রাস্তা দিয়ে মৃত্যুর দিকে এগোব। তোকে ছোটবেলায় আমি যে বাঘবন্দি

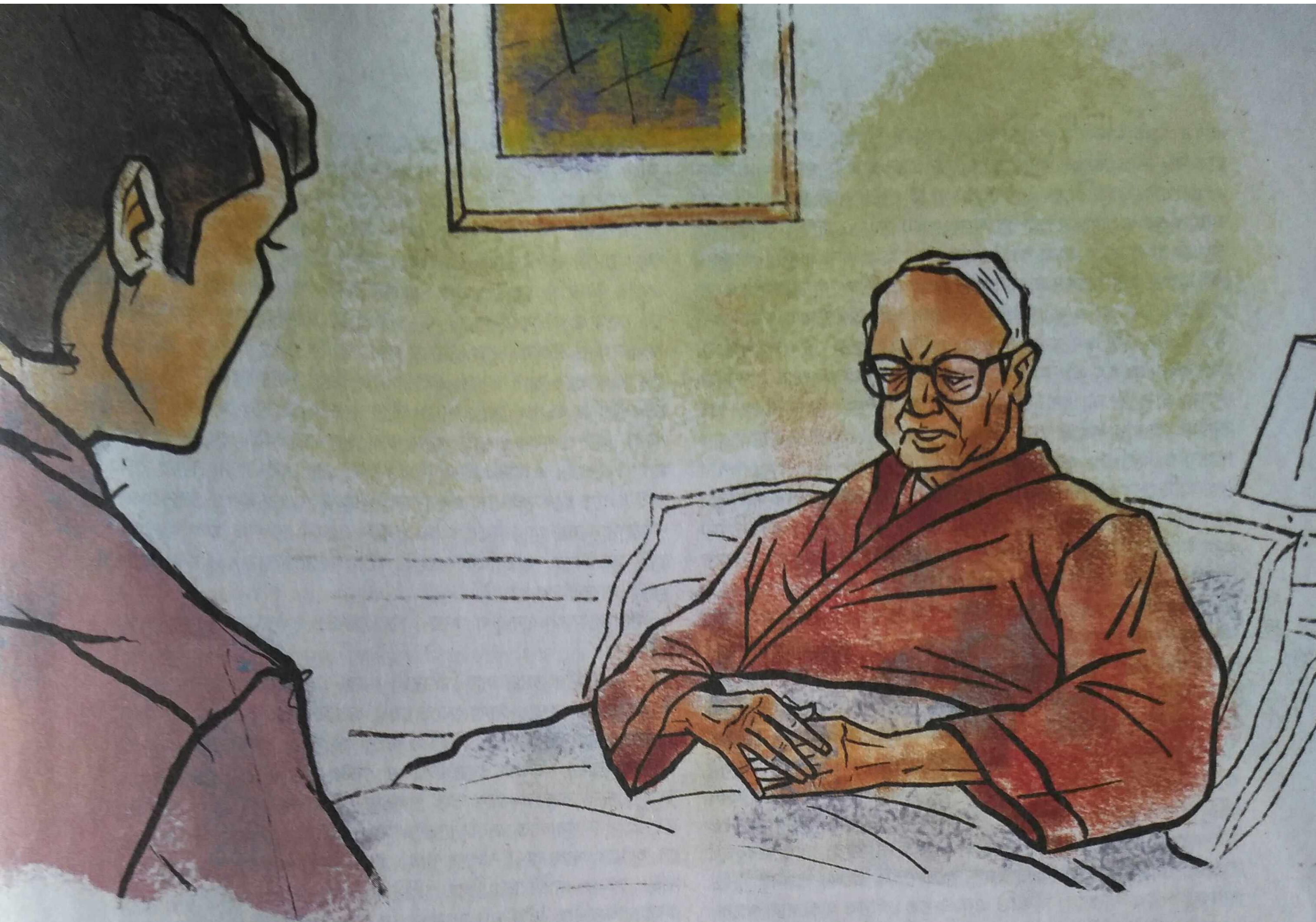

খেলা শিখিয়েছিলাম না, আমার অবস্থা এখন অনেকটা সেরকম। তবে তা নিয়ে আমার কোনও আফসোস নেই। অনেক বছর বেঁচেছি। কিন্তু মরার আগে কিছু কথা বলে যেতে চাই, যেটা অন্য কেউ জানে না। সেজন্যই আমি তোকে ডেকে পাঠিয়েছি।”

“কিন্তু তুমি কথাগুলো আমাকেই বলতে চাইছ কেন দাদু?”

“কারণ আমি মনে করি যে, একমাত্র তুমিই আমার কথাগুলো বুঝতে পারবে।”

মহীদাদু হঠাৎ ‘তুই’ থেকে ‘তুমি’তে চলে যাওয়ায় একটু থতমত খেয়ে যায় নয়ন। আর কোনও প্রশ্ন করে না। দাদুও একটু সময় স্থির হয়ে বসে বোধ হয় নিজের মনকে খানিকটা সংহত করেন। তারপর বলেন, “আমি যে পেশায় বিজ্ঞানী, সেটা তুই জানিস। কিন্তু আমি কী ধরনের কাজ করতাম সেটা নিশ্চয়ই তোর জানা নেই। জানা সম্ভবও নয়। সেটা বুঝতে হলে একটু পিছনে ফিরে যেতে হবে। আসলে খুব ছেলেবেলা থেকেই বিজ্ঞানে আমার আগ্রহ ছিল। আমাদের ছেলেবেলার সঙ্গে অবশ্য তোদের ছেলেবেলার অনেক পার্থক্য। তখন পৃথিবীটা অনেক অন্য রকম ছিল। বিজ্ঞান আজকের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিল। তবে তখনই কিন্তু সোমাটিক সেল থেকে ক্লোনিং আবিষ্কার হয়ে গিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই বিজ্ঞানীরা মানুষের শরীরের যে-কোনও কোষ থেকে ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গও বানিয়ে ফেলতে পারলেন। মানে এখন যেমন হার্ট, লাংস কিংবা কিডনি খারাপ হয়ে গেলে সেটা অনায়াসেই বদলে ফেলা যায়, সেটার শুরু তখন থেকেই। এর আগে সদ্য মারা গিয়েছে এমন মানুষের শরীর থেকে এগুলো তুলে এনে লাগানো হত। কিন্তু একজনের কোষের গঠনের সঙ্গে অন্যের কোষ যে পুরোপুরি মিলবে তা তো নয়। ফলে এই পদ্ধতিটা একশো শতাংশ সফল হত না। নিজের শরীরের কোষ থেকে ক্লোন করা শুরু হলে এই সমস্যাটা মিটে গেল।

“আমিও তখন কাজ করতাম ক্লোনিং নিয়েই। তবে আমার কাজের আসল ফোকাল পয়েন্ট ছিল ডি এন এ। তুই নিজে ল্যাবরেটরিতে কাজ

ciem
INSPIRING SUCCESS
CALCUTTA INSTITUTE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT
PRASANTA SUR CAMPUS (TOLLYGUNGE) A Private and Self-financed Engineering and Management Institute approved by AICTE and affiliated to MAKAUT
BCC&I THE BENGAL CHAMBER
Actively participating industry academia connect programmes in association with
20,558 SQ.MT. RAGGING AND ADDICTION FREE CAMPUS
12 ADVANCED LABS & LIBRARY WITH 60,000+BOOKS
OUTCOME BASED EDUCATION
UNIQUE ADD ON COURSES
HELP DESK FOR HIGHER STUDIES & STUDENT SCHOLARSHIPS
OVER 5000 ALUMNI THE WORLD OVER
HELP DESK FOR EDUCATIONAL LOAN & LOCAL ACCOMMODATION
4YRs. B.TECH
- Electronics & Communication Engineering (60)
- Electrical Engineering (120)
- Computer Science & Engineering (60)
- Information Technology (60)
- Instrumentation & Control Engineering (60)
- Civil Engineering (60)
3YRs. UG PROGRAMME BBA BCA
- Bachelor of Business Administration [H] (40)
- Bachelor of Computer Application (40)
2YRs. PG PROGRAMME MBA
Master of Business Administration [MBA] (60)
Specialisations in:
- Marketing
- Finance
- HR
- Systems
Chandi Ghosh Road, Kolkata – 700040 E-mail: info@ciem.ac.in Website: www.ciem.ac.in
24219951, 9830626283, 9477457948, 9830375618

করিস। তাই মানুষের শরীরে ডি এন এ-র ভূমিকা তোকে বোঝাতে হবে না। ভাল করেই জানিস যে, ডি এন এ-র সামান্য পরিবর্তনে একটা মানুষের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো কীভাবে পালটে যেতে পারে। আমার অবশ্য চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়ে তেমন কোনও মাথাব্যথা ছিল না। আসলে সেই সময় এমন কতগুলো অসুখ ছিল, যার ওষুধ বিজ্ঞানীরা বের করতে পারছিলেন না। বের করা সম্ভব হচ্ছিল না, কারণ এগুলো সবই ছিল ডি এন এ-র ত্রুটি। ত্রুটি বলাটা বোধ হয় ঠিক হল না নয়ন, বলা উচিত, ডি এন এ-র কিছু ক্যারেক্টারের জন্য এই অসুখগুলো হত। কোনওভাবে এই ক্যারেক্টারগুলোকে ডি এন এ থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া যায় কি না, সেটাই আমি চেষ্টা করছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই সরকার আমার কাজে খুবই উৎসাহী ছিল এবং আমাকে নানাভাবে সাহায্যও করছিল। প্রায় পঞ্চাশ বছর এটা নিয়ে টানা কাজ করার পর আমি শেষ পর্যন্ত এই ক্যারেক্টারগুলোকে আলাদা করার পদ্ধতিটা বের করে ফেলি। এর মধ্যে বুঝতেই পারছিস যে আমার শরীর, মন এবং মস্তিষ্ক যাতে সম্পূর্ণ সচল এবং স্বাভাবিক থাকে, সেজন্য যেসব রিপ্লেসমেন্ট দরকার সবই করা হয়েছে।’’

ঠাকুরমা কফি নিয়ে এসেছিলেন। গরম কফিতে একটা চুমুক দিয়ে মহীদাদু ফের বলতে শুরু করলেন, ‘‘আমি এই পদ্ধতিটা আবিষ্কার করার পর সারা বিশ্বের অন্যতম সেরা সব বিজ্ঞানী আর সরকারের সর্বোচ্চ পদে যাঁরা আছেন, তাঁদের নিয়ে একটা মিটিং হয়। সেখানেই জন্ম হয় পারফেক্ট ইউনিভার্স মানে পিউ-এর। তার মানে বুঝতেই পারছিস, পিউ-এর একেবারের শুরুর সদস্য যাঁরা, তাঁদের মধ্যেই আমি ছিলাম। আসলে আমরা সবাই চাইছিলাম পৃথিবীতে যেন অধিকাংশ মানুষ সুস্থসবল থাকে। এই ধরনের রোগ, যার কোনও চিকিৎসা নেই, তাতে যেন আর কেউ কষ্ট না পায়। তাই ঠিক হয় মায়ের শরীরের ভিতর ভ্রূণ যখন সবে তৈরি হচ্ছে, তখনই সেটা পরীক্ষা করে দেখা হবে। যদি ডি এন এ-তে কোনও গন্ডগোল থাকে, তা হলে তখনই সেই ক্যারেক্টারগুলো বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। তা হলে যে শিশু জন্মাবে তার আর এই ধরনের কোনও অসুখ হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। এভাবেই আস্তে-আস্তে একসময় পৃথিবী থেকে এইসব রোগের অস্তিত্বই লুপ্ত হয়ে যাবে।

‘‘বুঝতেই পারছিস, এরকম একটা মহৎ প্রস্তাব আমাদের সকলেরই খুব ভাল লেগেছিল। আপত্তির কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। আর আমি যেহেতু এই পদ্ধতিটার মূল আবিষ্কর্তা, তাই আমার সম্মান এবং মতামত, দুই-ই খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমার সঙ্গে এই প্রজেক্টে আরও দু'জন কাজ করেছিলেন। একজন ইহুদি বিজ্ঞানী ডঃ নাথনিয়াল, আর-একজন আফ্রিকার বিজ্ঞানী সুনে স্টাসেন। আমার মতো এঁরা দু'জনও ওই মিটিং থেকেই পিউ-এর সদস্য হয়ে যান। তবে তখনই আমাদের এটাও বলে দেওয়া হয় যে, পিউ-এর এইসব কাজকর্মের বিষয়টা সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হবে। সাধারণ মানুষকে এবিষয়ে কিছু জানানোর প্রয়োজন নেই। কথাটা শুনে আমি আপত্তি করেছিলাম। কারণ আমার মনে হয়েছিল যে, আমরা তো মানুষের ভালর জন্যই কাজটা করছি, তা হলে সেটা জানাতে অসুবিধে কোথায়। কিন্তু তার উত্তরে আমাকে বোঝানো হয় যে, এত জটিল ব্যাপার সবাইকে বিস্তারিতভাবে বোঝানো যথেষ্ট কঠিন। ঠিকমতো না বুঝেই যদি কেউ আপত্তি করে তখন আমাদের প্রজেক্টটা সাকসেসফুল হবে না। কথাটার মধ্যে যুক্তি ছিল। তা ছাড়া অন্যরাও কেউ আপত্তি করেননি। তাই আমি শেষপর্যন্ত রাজি হয়ে যাই।’’

‘‘তোমাদের প্রজেক্টটা নিয়ে কি শেষপর্যন্ত কাজ শুরু হয়েছিল?’’

‘‘হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তবে কীভাবে কাজটা হচ্ছে, তা নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাইনি। কারণ, একবার কাজ শুরু হয়ে গেলে তখন তো সেটার দায়িত্ব ডাক্তার আর প্রশাসনে যাঁরা আছেন তাঁদের। বিজ্ঞানীর কাজ তো ওখানেই শেষ। তা ছাড়া সরকার থেকে আমাকে বলা হয়েছিল ডি এন এ নিয়ে গবেষণার কাজটা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে। কারণ ডি এন এ-র সব অন্ধিসন্ধি হাতের মুঠোয় এসে গেলে যে যুগান্তকারী অনেক কিছু ঘটিয়ে ফেলা যাবে, সেটা ততদিনে সবাই বুঝে ফেলেছে।’’

‘‘তোমার সঙ্গে কি বাকি দু'জনও তখন কাজ করছিলেন?’’

নয়নের কথাটা শুনে মহীদাদুর সঙ্গে একবার ঠাকুরমার চোখাচোখি হল। তারপর মহীদাদু একটু বিষণ্ণ হেসে বললেন, ‘‘না, ওদের দু'জনের কেউই আর আমার সঙ্গে কাজ করেনি। নাথনিয়াল যে-কোনও কারণেই হোক ডি এন এ নিয়ে গবেষণায় আর আগ্রহী ছিল না। ও একটা নতুন ধরনের ফল তৈরির চেষ্টা করছিল, যা খেতে খুব ভাল হবে আর তাতে এমন সব পুষ্টিগুণ থাকবে যাতে মানুষের জীবনীশক্তি বহুগুণ বেড়ে যাবে। তবে কাজটা ও শেষ করতে পারেনি। কারণ কয়েক বছর পরেই আমি কাগজে পড়েছিলাম যে, নাথনিয়াল মারা গিয়েছে। আমার থেকে নাথনিয়াল বেশ খানিকটা ছোটই ছিল। তাই বলতে হবে তুলনায় অল্পবয়সেই ও মারা গিয়েছিল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত মানুষের মৃত্যু নিয়ে আমার মনে তেমন কোনও প্রশ্ন জাগেনি। তাই মৃত্যুটাকে স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছিলাম। এখন অবশ্য মাঝে-মাঝে মনে হয়...’’

কথার মাঝখানে চুপ করে গিয়ে আবার দু'-চুমুক কফি খেলেন মহীদাদু।

‘‘কফিটা কি ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে? আর-এক কাপ এনে দেব?’’

ঠাকুরমার কথায় মাথা নেড়ে ফের বলতে শুরু করলেন, ‘‘সুনেও আমার সঙ্গে আর কাজ করেনি। ওকে সরকার থেকে অন্য একটা কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ও সেটা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আমার সঙ্গে অনেক বছর তার কোনও যোগাযোগও ছিল না। কিন্তু হঠাৎই সুনে সোলার ডায়েরিতে আমাকে একটা মেসেজ পাঠায় যে, সে আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। আমি যেন সস্ত্রীক তার বাড়িতে যাই। তখনও আমি জুরান্তিতে আসিনি। তাই কোথাও যাওয়া-আসা করতে অসুবিধে ছিল না। সুনে তখন থাকত জার্মানির একটা ছোট্ট শহরে। সেখানেই ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করত।

‘‘তার নেমন্তন্ন পেয়ে আমি আর তোর ঠাকুরমা সেখানে গেলাম। ভারী সুন্দর একটা ছোট্ট বাড়ি। তখন শীতকাল। চারদিক বরফে ঢেকে গিয়েছে। সুনে ছিল ভারী আমুদে মেয়ে। কুচকুচে কালো রং। মাথাভর্তি রিংয়ের মতো পাকানো চুল আর ঝকঝকে দাঁতের হাসি। আমার কাছে সুনের এই চেহারাটাই সবসময় চোখের উপরে ভাসে। কিন্তু সেবার গিয়ে দেখি ওর সেই ঝকঝকে ভাবটাই আর নেই। কেমন যেন একটা সন্ত্রস্ত চেহারা। আমাদের দেখে অবশ্য খুশি হল খুব। সারাদিন নানা রকম গল্পটল্পও হল। একজন মোটাসোটা জার্মান মহিলা রোবট, সেই বাড়ির সব কাজকর্ম করে। রাতে ডিনারের পর তাকে সুইচ্‌ড অফ করে সুনে আমাদের সঙ্গে কফি নিয়ে বসল।

‘‘তখনই জানতে পারলাম সেই ভয়ংকর কথাটা। আমরা যে মানুষের মৃত্যুকে স্বাভাবিক মনে করছি, সেটা আসলে স্বাভাবিক নয়। খুব ধীরে-ধীরে মানুষের শরীরে এমন একটা কেমিক্যাল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যেটা একটু-একটু করে দেহের দুটো-একটা ভাইটাল অরগ্যানকে নষ্ট করে দেয়। কাজটা এমনভাবে চলে, যে যার শরীর সে নিজে কোনও অসুবিধে টের পায় না। তাই ডাক্তারের কাছে যাওয়ারও প্রয়োজন হয় না। তারপর হঠাৎ একদিন সেই অরগ্যানগুলো কাজ বন্ধ করে দেয় আর মানুষটির মৃত্যু হয়।’’

‘‘সুনে স্টাসেন কী করে কথাটা জানতে পারলেন?’’

‘‘সেটাই তো বলছি শোন। আসলে এই কেমিক্যালটা আবিষ্কার করেছিল সুনে নিজেই। তোকে একটু আগে বললাম না, সুনে আমার সঙ্গে কাজ করেনি। ওকে একটা আলাদা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এটাই ছিল সেই কাজ। অবশ্যই সুনে নিজে আসল কথাটা জানত না। ওকে বলা হয়েছিল, আমাদের এই সোলার সিস্টেমের বাইরের কিছু প্রাণীর নাকি এই সৌরজগতে ঢুকে পড়ার আশঙ্কা আছে। যাঁরা মহাকাশ নিয়ে চর্চা করেন, তাঁরা সেরকমই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই অন্য সৌরজগতের জীবরা ঠিক কী ধরনের, সে সম্পর্কে এখনও কোনও

নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। তাই তাদের সম্ভাব্য আক্রমণ আটকাতে নানা ধরনের প্রস্তুতি চলছে। সুনের কাজটাও তারই একটা পার্ট। এমন কয়েকজন মানুষ এই কথাগুলো বলেছিলেন যে, সুনে ব্যাপারটা বিশ্বাস করেছিল। এটাও ওকে বলা হয়েছিল যে, রাসায়নিক বিষটা তৈরি হবে সেটা যেন খুব ধীরে-ধীরে প্রায় বুঝতে না দিয়ে শরীরে কাজ করে। যেহেতু সেই সব অজানা গ্রহের জীব সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা নেই। তাই এই সাবধানতাটা নেওয়া দরকার। সুনে কেমিক্যালটা তৈরি করার পর সেটা প্রথমে বাঁদরের উপর এক্সপেরিমেন্ট করে। বাঁদরটার মরতে সময় লেগেছিল পাঁচ বছর। তখন ওকে বলা হয় ওই টাইমস্প্যানটা বাড়িয়ে দশ বছর করতে। সেটা করতে অবশ্য ওর খুব একটা অসুবিধে হয়নি। কাজটা শেষ করে ও পিউ-কে দিয়ে দেয়। তখনও পর্যন্ত ওর মনে এটা নিয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না।''

''সন্দেহটা তা হলে হল কীভাবে?''

''খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে বলতে পারিস। সুনের এক বান্ধবী ছিল, তার নাম মারিয়া। তাকেও আমিও চিনি। ভদ্রমহিলা ব্লাড সেল নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। তিনি হঠাৎ মারা যান। মারিয়া থাকতেন সুনের বাড়ির কাছাকাছি একটা শহরে। তাই মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সুনে তাঁর বাড়িতে গেছিল। নিয়মমাফিক মৃতদেহের পাশে ফুল রাখতে গিয়ে সে চমকে ওঠে। মারিয়ার দু'চোখের পাতার উপর ছিল কালো ফুটকি-ফুটকি দাগ। পাশাপাশি চার-পাঁচটা কালো তিল থাকলে যেরকম হয়, অনেকটা সেরকম। সুনে আমাকে বলে, সে যখন এক্সপেরিমেন্টটা করছে, তখন প্রথমে অনেক একই ধরনের রাসায়নিক তৈরি করেছিল। জীবন্ত প্রাণীর উপর সেগুলো প্রয়োগ করার পর, যাতে কোনওভাবে গুলিয়ে না যায়, তাই প্রত্যেকটার আলাদা-আলাদা চিহ্ন ছিল। কোনওটাতে মৃত জীবটার কানের উপরটা নীলচে হয়ে যেত, কোনওটাতে জিভের মাঝ বরাবর একটা গাঢ় লাল রেখা পাওয়া যেত, এইরকম আর কী। ফাইনালি যে রাসায়নিকটা ও পিউকে দিয়েছিল, সেটার বৈশিষ্ট্য ছিল চোখের পাতার উপর ওরকম কালো ফুটকি-ফুটকি দাগ। বুঝতেই পারছিস মারিয়ার চোখের পাতায় ওরকম দাগ দেখে সুনে ভয়ানক চমকে ওঠে।

''কেমিক্যালটা পিউ-কে দিয়ে দেওয়ার পর ততদিনে প্রায় পনেরো বছর কেটে গিয়েছে। বাড়ি ফিরে সুনে পুরনো কাগজপত্র দেখে বুঝতে পারে পিউকে ওটা হ্যান্ডওভার করার সময় সে এই কালো-কালো ফুটকি হওয়ার ব্যাপারটা জানায়নি। আসলে এটা তেমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে তখন তার মনেই হয়নি। পুরো ঘটনাটা নিজের মনে বিশ্লেষণ করে সুনে ঠিক করে যে তার সন্দেহটা সত্যি কিনা সেটা আগে বুঝে নেওয়া দরকার। তারপর চেনা-পরিচিতের মধ্যে কারও মৃত্যুসংবাদ পেলেই সে সেখানে যেতে শুরু করে এবং বছর তিন-চারের মধ্যেই নিশ্চিতভাবে বুঝে যায় যে-কোনও মৃত্যুই স্বাভাবিক নয়। প্রতিটি মানুষকেই মারা হচ্ছে তার তৈরি করা কেমিক্যাল দিয়েই। কারণ সকলেরই চোখের পাতার উপরে থাকছে ঠিক একই রকম কালো দাগ।

''সুনে তখন যে মানুষরা মারা যাচ্ছে, তাদের জীবন এবং কাজকর্ম নিয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করে এবং সেগুলো বিশ্লেষণ করে তার মনে হয়, প্রতিটি মৃত্যুর একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন আছে। এঁরা সবাই অন্তত বছর দশ-বারো আগে নতুন কোনও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মানে যে কাজ তাঁরা করছিলেন তার থেকে সরে এসে অন্য কিছু করতে শুরু করছেন কিংবা অনেক সময় কিছুই না করে শুধু নিজের খুশিমতো জীবন কাটাবেন ঠিক করে ফেলেছেন। সুনের মনে হয়, পিউ এই মানুষগুলোকে তখনই খরচের খাতায় ফেলে দিয়েছে এবং তারপরেই এদের মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। কারণ পিউ-এর কাছে পারফেক্ট ইউনিভার্সে এরকম বেকার মানুষের কোনও জায়গা নেই।

''সুনে আমাকে বলে যে, বিভিন্ন রকম ঘটনা এবং তথ্য বিশ্লেষণ করে সে বুঝতে পেরেছে যে পিউ প্রতি বছর একটা লিস্ট তৈরি করে। তাতে লেখা থাকে নেক্সট টেন ইয়ারে কোন-কোন মানুষের মৃত্যু হবে। তারপর তাদের শরীরে ওই কেমিক্যালটা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এখন সেটা কাকে কীভাবে দেওয়া হবে তার নিশ্চয়ই নানারকম পদ্ধতি আছে। তবে সব থেকে সহজ পদ্ধতিটা হল ওষুধের মাধ্যমে দেওয়া। কারণ, সব মানুষই তো এখন বহু বছর বাঁচে। তাই সুস্থ থাকার জন্য নানা রকম ওষুধ তাদের খেতেই হয়। বাড়িতে কাজের জন্য যে রোবট আছে, তাকে কয়েকটা প্রোগ্রাম ফিড করে দিয়ে একাজটা অনায়াসেই করিয়ে নেওয়া যায়। এরকম যে হতে পারে সেই চিন্তা তো কারও মাথাতেই আসবে না। তাই সন্দেহেরও কোনও ব্যাপার নেই। সবটাই একদম ঠিকঠাক মসৃণভাবে চলে।''

কথাটা শেষ করে মহীদাদু নয়নের মুখের দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে বলেন, ''তোর নিশ্চয়ই আমার কথাগুলো বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই না? আমারও হয়নি। আমি ভেবেছিলাম সুনে একটু অতিমাত্রায় কল্পনাপ্রবণ হয়ে পড়েছে। ওর মধ্যে হয়তো কোনও কারণে মৃত্যুভয় কাজ করছে, তাই এসব ভাবছে। তাই আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তুমি কি শুধু এই কথাগুলো বলার জন্যই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ, নাকি আমার কাছে কোনও সাহায্য চাইছ?'

''উত্তরে সুনে বলল, 'না মহী, তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে না আমি জানি। ইনফ্যাক্ট পৃথিবীর কেউই আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। কারণ কেউ কথাটা বিশ্বাসই করবে না। কিন্তু আমি ঠিক করেছি পিউ-এর যাদের হাতে আমি জিনিসটা দিয়ে দিয়েছি, তাদের সঙ্গে দেখা করে আমি এই সন্দেহের কথাটা বলব। যদিও আমার আশঙ্কা সেটা বলার পর আমার পক্ষে হয়তো আর বেশিদিন বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না। আমি নিজেও জানি না যে আমার শরীরের ভিতর ওই কেমিক্যালের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে কি না। তাই আমি ঠিক করেছিলাম যে পিউ-এর সঙ্গে কথা বলার আগে আমি কোনও একজনকে পুরো ঘটনাটা জানাব। সব দিক ভেবে মনে হয়েছে তুমিই হচ্ছ রাইট পার্সন। তুমি আমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস না

INDIAN ASSOCIATION FOR THE
CULTIVATION OF SCIENCE
(Deemed to be university under de-novo category)
A premier Science Research & teaching Institute
Festive greetings to all

করলেও উড়িয়ে অন্তত দেবে না। তাই তোমাকে আসতে বলেছিলাম।'

কথা থামিয়ে মহীদাদু তার বিছানার পাশে রাখা সোলার ঘড়িটার দিকে তাকালেন।

"চিন্তা কোরো না। এখনও অনেক সময় আছে। পাঁচটার আগে পিলুর সুইচ অন করার দরকার নেই। আমি ঠিক সময়ে তোমাদের সতর্ক করে দেব।"

ঠাকুরমার কথা শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে মাথা নাড়েন মহীদাদু। সেই সুযোগে নয়ন বলে ওঠে, "তুমিও কি আমাকে এই কথাগুলো বলার জন্যই ডেকে এনেছ?"

"না, তোমাকে ডেকে এনেছি আমার কিছু কথা বলার জন্য। কিন্তু তার আগে সুনের কথাটা বলা দরকার ছিল। কারণ তা না হলে আমি কেন ভাবছি যে আর বেশিদিন বাঁচব না, সেটা তুমি বুঝতে পারবে না। যাই হোক, যে কথা বলছিলাম সেটা শেষ করে নিই। সুনের বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ কিছু ভাবিনি। সত্যি কথা বলতে, তোর ঠাকুরমার কিন্তু সুনের কথা অনেকটাই বিশ্বাস হয়েছিল, আমার সঙ্গে বেশ কয়েকবার আলোচনাও করেছিল। কিন্তু আমিই তেমন একটা মাথা ঘামাতে চাইনি। তবে বছরখানেক পর, খানিকটা কৌতূহলবশতই ব্যাপারটা কোন দিকে গড়াল জানতে ওর সঙ্গে মনোবাহীতে যোগাযোগ করেছিলাম। তখন শুনলাম ও নাকি আর জার্মানিতে থাকে না। ভূমধ্যসাগরের একটা ছোট্ট দ্বীপে নতুন আস্তানা গেড়েছে। সেটা নাকি ভারী সুন্দর জায়গা। ওর শোওয়ার ঘরের বিছনায় শুয়ে সমুদ্রের উপর সূর্যোদয় দেখা যায়। ওর ফলের বাগানে প্রতিদিন ঝাঁকে-ঝাঁকে রংবেরংয়ের পাখি আসে। এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে এসব কথা বলছিল যে, আমি আর পুরনো প্রসঙ্গ তোলার সুযোগই পেলাম না। সুনে খুবই ভাল আছে ধরে নিয়ে আমি আর ওর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করিনি। কিন্তু তার বছরতিনেক পরে সে মারা গিয়েছে জেনে আমার বেশ জোরালো খটকা লাগল। সেটা আরও প্রবল হল কিংবা বলতে পারিস, সুনের কথাগুলো আমি বিশ্বাস করতে শুরু করলাম যখন পিউ-এর নির্দেশে আমাদের নতুন ঠিকানা হল জুরান্তি।"

"তার মানে তুমি বলতে চাইছ, ভূমধ্যসাগরের ওই দ্বীপে আসলে সুনে স্টাসেনকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল?"

"এগজ্যাক্টলি! এখন আমার কোনও সন্দেহ নেই যে, সুনে কথাগুলো পিউ-এর কর্তাব্যক্তিদের জানিয়েছিল এবং তার ফলেই ওকে ওই দ্বীপে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সুনে আশঙ্কা করেছিল যে, ওর শরীরেও কেমিক্যাল ঢোকানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে সেটাও একদম ঠিকঠাক। কারণ আমরা ওর বাড়িতে যাওয়ার ঠিক আট বছর পর সুনে মারা যায়। কাজটা সম্পূর্ণ করতে কেমিক্যালটার যেহেতু দশ বছর সময় লাগে, তা হলে আমি ধরেই নিতে পারি যে বছরদুয়েক আগে থেকেই সুনের শরীরে ওই বিষ ঢোকা শুরু হয়ে গিয়েছিল।"

"সুনেকে কেন নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল সেটা তো না হয় বুঝলাম। কিন্তু তোমাদের কেন জুরান্তিতে পাঠানো হল? তোমরা তো সেরকম কিছু করোনি।"

মহীদাদু একটু হেসে বললেন, "আমি কী করেছি সেটাই এবার তোকে বলব। কিন্তু তার আগে আর-এক কাপ কফি পেলে ভাল হয়।"

"তোমরা কথা বলো, আমি বানিয়ে নিয়ে আসছি।"

ঠাকুরমা উঠে গেলে, কম্বলটা আর-একটু ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে মহীদাদু ফের শুরু করলেন, "তোকে তো বললাম যে, ডি এন এ থেকে কীভাবে নানা রকম অসুখের কারণগুলো বাদ দিয়ে দেওয়া যায় সেটা আমি আবিষ্কার করেছিলাম। কিন্তু সেখানেই আমার কাজটা থেমে থাকেনি। গবেষণা করতে-করতে আমি একসময় ডি এন এ-র পুরো স্ট্রাকচারটাকেই অসংখ্য টুকরোয় ভেঙে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করতে পারলাম। এই টুকরোগুলোর প্রতিটাই ছিল মানুষের চরিত্রের নানা রকম বৈশিষ্ট্যের উৎস। যেমন ধর কেউ ভিতু, কেউ দুর্বল, কারও আবার ভয়ংকর সাহস, কেউ বিজ্ঞান ভালবাসে, কারও ডাক্তারি পছন্দ, এসব কিছুর পিছনেই আসলে আছে ডি এন এ-এর একটা করে নির্দিষ্ট টুকরো। এবার ডি এন এ-এর কোন টুকরো মানুষকে কী বৈশিষ্ট্য দেয় তার একটা তালিকাও আমি তৈরি করেছিলাম। ক্রোমোজোমের আবিষ্কর্তার নাম অনুসারে তার নাম দিয়েছিলাম 'মেন্ডেলস লিস্ট'।

"পিউ-এর কর্তাব্যক্তিরা এই লিস্টটা পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন। কারণ তাঁদের মনে হয়েছিল এই লিস্টটা হাতে থাকলে কোনও সময় যদি পৃথিবীতে কোনও বিশেষ ধরনের মানুষের প্রয়োজন বাড়ে, তা হলে ডি এন এ ওই অংশটা ক্লোন করে সেরকম মানুষ তৈরি করে ফেলা যাবে। কথাটা আমার পছন্দ হয়নি, কিন্তু আমি কিছু বলিনি, কারণ আমি জানতাম কাজটা করা এককথায় অসম্ভব। ডি এন এ-এর একটা অংশকে ক্লোন করে সাপ-ব্যাঙ আর যাই-ই তৈরি করা যাক, মানুষ অন্তত তৈরি করা যাবে না। তবে সেটা পিউ-এর কর্তাব্যক্তিদের বললে আবার উলটো বিপদ আছে। তাঁরা হয়তো পুরো প্রজেক্টটাকেই অকেজো বলে বাতিল করে দেবেন। অথচ আমি নিজে তো বুঝতে পারছি যে, এই তালিকাটা থাকলে ভবিষ্যতে সব ধরনের জিনের অসুখ আমরা সারিয়ে ফেলতে পারব।

"আরও একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছিলাম, ডি এন এ-এর ওইরকম টুকরো একটা অংশকে ক্লোন করা যাবে না ঠিকই, কিন্তু সেটাকে শক্তিশালী করা যাবে। তার মানে বুঝতে পারছিস তো, একটা মানুষকে কোনও একটা বিষয়ে এক্সপার্ট বানানো যাবে, মানুষ হিসেবে তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই। আমি ঠিকও করে নিয়েছিলাম যে আমার পরবর্তী গবেষণার বিষয়ও এটাই হবে। তবে তখনও পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলাম না বলে পিউ-কে এবিষয়ে কিছু জানাইনি। আমার কাজটা পছন্দ হওয়ায় একটা সুবিধে হয়েছিল, পিউ-এর তরফে আমাকে একটা মুম্বই শহরে একটা সুন্দর বাড়ি আর তার সঙ্গে একটা চমৎকার ল্যাবরেটরি দেওয়া হয়, যাতে আমি নির্বিঘ্নে আমার কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারি।"

"এবার আর কফি বানালাম না। কোকোর সঙ্গে আমাদেরই বাগানের একটা গাছের শুকনো পাতা গুঁড়ো করে মিশিয়ে দিয়েছি। খেয়ে দ্যাখ, ভাল লাগবে। এটা আসলে একধরনের এনার্জি ড্রিঙ্ক। আজ তো আমাদের ঘুম খুব কম হবে। এটা খেলে ক্লান্ত দেখাবে না। পিলুও কিছু বুঝতে পারবে না," ট্রে-টা টেবিলে নামিয়ে রেখে দুটো বড় মাগ নয়ন আর মহীদাদুর হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন ঠাকুরমা।

আগের কথার খেই ধরে মহীদাদু বলতে শুরু করলেন, "মুম্বইয়ের ল্যাবরেটরিতে আমি নিশ্চিন্ত মনে কাজ করে যাচ্ছিলাম। প্রায় পঁচিশ বছর একইভাবে কেটেছিল। আমার গবেষণার কাজও তখন প্রায় শেষের মুখে। এই সময় একদিন আমি আমার এক ডাক্তারবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে হাসপাতালে যাই। এর আগে বহু বছর আমার হাসপাতালে যাওয়ার কোনও দরকার পড়েনি। ওষুধ তো সব বাড়িতেই আনিয়ে নেওয়া যায়। ছোটখাট রিপ্লেসমেন্টও এখন বাড়িতেই হয়। সেই সময় আমার কোনও ভাইটাল অরগ্যানের রিপ্লেসমেন্ট দরকারও হয়নি। যাই হোক, হাসপাতালে যেখানে আমার বন্ধু বসে, সেখানে যাওয়ার সময় দেখি একটা দরজার উপর লেখা আছে ডি এন এ কারেকশন রুম। স্বাভাবিকভাবেই আমার একটু জানার আগ্রহ হয় যে, কী ধরনের ডি এন এ কারেকশন এখানে হয়। তাই আমি সেটা আমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করি। আমার প্রশ্ন শুনে ডাক্তার তো অবাক, 'সে কী! তুমি ডি এন এ নিয়ে এত কাজ করেছ আর এটা জান না! এখন তো সব বাচ্চারই ডি এন এ কারেকশন হয়। সবে যখন শরীরের সেলগুলো তৈরি হতে শুরু করে তখনই কারেকশন করে দিই আমরা।'

" 'কী কারেকশন করো?'

" 'একটা ডেফিনিট লিস্ট আছে। তার সঙ্গে মিলিয়ে করতে হয়।'

" 'সব বাচ্চার জন্য একই লিস্ট?'

" 'হ্যাঁ। তা তো হবেই। কারণ এই কারেকশনটা তো আসলে আমরা করছি যাতে ভবিষ্যতে কোনও ধরনের জিনের অসুখ কিংবা

ডি এন এ-এর ত্রুটিতে মানুষকে ভুগতে না হয়।’

“ডাক্তারের কথা শুনে আমার বিস্ময় ক্রমশ বাড়ছিল। কারণ আমি তো জানি কোনও ত্রুটি না থাকলে বাচ্চার ডি এন এ কারেকশনের কোনও দরকার নেই। কিন্তু এই ভদ্রলোক পিউ-এর কাজকর্ম কিংবা আমার রিসার্চের ব্যাপারে খুব বিস্তারিতভাবে কিছুই জানেন না। তাই আমি খুব সরল মুখ করে তাকে বলি, ‘ওই লিস্টটা আমাকে দেখাতে পারো?’

“ডাক্তার তার ড্রয়ার খুলে লিস্টের একটা কপি বের করে আমার হাতে দেয়। আমি দেখি সেটা আমারই তৈরি মেন্ডেলস লিস্ট। তবে তাতে কোন টুকরোর কী কাজ সেটা লেখা নেই, আর কিছু-কিছু জায়গা মার্ক করা আছে। ডাক্তার আমাকে জানান, কারেকশনের সময় ওই মার্ক করা অংশগুলো তাঁরা বাদ দিয়ে দেন। তাঁদের উপর সেরকমই নির্দেশ আছে কারণ এটা করলে বাচ্চা অনেক বেশি সুস্থ আর কর্মক্ষম হয়। ডাক্তারের কাছে এটাও জানতে পারি যে, এই ডি এন এ কারেকশনের কাজটা তাঁরা করছেন গত কুড়ি বছর ধরে।

“ডাক্তারের কাছ থেকে লিস্টটা নিয়ে বাড়ি এসে আমার তৈরি মেন্ডেলস লিস্টের সঙ্গে মিলিয়ে যা দেখি, তাতে আমার মাথা ঘুরে যায়! কারেকশনের নামে ডি এন এ-এর যে অংশগুলো বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাতে বাদ পড়ে যাচ্ছে মানুষের সব রকম শিল্পীসত্তা, নতুন কোনও সৃষ্টির ভাবনা আর প্রতিবাদ কিংবা বিদ্রোহ করার ইচ্ছে। তার মানে এই কারেকশনের পর যেসব শিশুরা জন্মাচ্ছে, তাদের গান, নাচ, গল্প কবিতা, ছবি আঁকা এসব নিয়ে কোনও আগ্রহ থাকবে না। তারা নতুন কিছু ভাবতে পারবে না। এমনকী কোনও অন্যায় দেখে প্রতিবাদ পর্যন্ত করবে না, কারণ প্রতিবাদ করার ইচ্ছেটাই তাদের মনের মধ্যে তৈরি হবে না। আমি বুঝতে পারছিলাম পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যাতে মুখ বুজে তাদের হুকুম তামিল করে যায়, সেজন্যই এই ব্যবস্থা করেছে পিউ। তাদের নির্দেশে তৈরি হচ্ছে লক্ষ-লক্ষ রক্তমাংসের রোবট। তবে পিউ-এর সদস্যরা তো বোকা নয়। তাই একেবারে তাদের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে অল্প কিছু শিশু নিশ্চয়ই জন্মাচ্ছে যাদের ডি এন এ কারেকশন হচ্ছে না। স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে বড় হয়ে ওঠা এই শিশুরাই হবে পৃথিবীর শাসনকর্তা। মানে আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সবই এখন পিউ-এর হাতের মুঠোয়।

“সবটা বুঝতে পেরে প্রথমটায় আমার মনে হচ্ছিল নয়ন, আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাব। কারণ আমার আবিষ্কারকে ব্যবহার করে এত বড় একটা অন্যায় হচ্ছে, সেটা সহ্য করা খুব কঠিন। কিন্তু তারপর আমি আস্তে-আস্তে শান্ত হয়ে ঠিক করলাম যে, এর প্রতিকার আমাকেই করতে হবে। তোর ঠাকুরমাও আমাকে একই কথা বলল। যদিও তখনও আমি জানি না যে কীভাবে, কোন পথে আমাকে এগোতে হবে। সেইসময় একদিন তোর মা-বাবা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। কথায়-কথায় জানতে পারি যে, ঠিক তিনদিন পরে তাদের বাচ্চার ডি এন এ কারেকশনের ডেট দেওয়া হয়েছে। কোন হাসপাতালে হবে সেটাও তোর মা আমাকে বলেছিল। ভাগ্য ভাল যে, সেই হাসপাতালের দায়িত্বে যিনি ছিলেন তিনি পিউ-এর নিচুতলার একজন সদস্য। তিনি আমাকে চিনতেন। আমি যে পিউ-এর একজন রীতিমতো হোমরা-চোমরা লোক সেটাও তাঁর জানা ছিল। আমি তখন তাঁকে গিয়ে মিথ্যে করে বলি যে, আমার গবেষণার জন্য কয়েকটা ডি এন এ কারেকশন আমাকে নিজের হাতে করতে হবে। পিউ সেটা জানে। আমাকে তারা অনুমতিও দিয়েছে। তাই তোর মা মানে শ্রীমতীর ক্ষেত্রে ডি এন এ কারেকশনটা আমি নিজে হাতে করব। ভদ্রলোক আমার প্রস্তাবে রাজিও হয়ে যান।”

“তারপর...”

উত্তেজনায় নয়নের গলা প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে। মহীদাদু একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে বলেন, “আমি হিসেব করে দেখেছিলাম, আমার মেন্ডেলস লিস্ট পিউকে দেওয়ার আগেই তোর মায়ের জন্ম হয়েছে। অর্থাৎ তার ডি এন এ কারেকশন হয়নি। তার মানে সে একজন স্বাভাবিক মানুষ। তোর বাবাও তাই। যাই হোক, হাসপাতালের যিনি ইনচার্জ ছিলেন, সেই ডঃ সুরানা আমার কথায় রাজি হয়ে গেলেন। আমি এটাও বললাম যে, কাজটা আমি একাই করব, কারণ ব্যাপারটা গোপন রাখা দরকার। তাতেও কোনও আপত্তি হল না। আমার তখনকার পদমর্যাদায় সেটা না হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। সুতরাং তোর ডি এন এ কারেকশন আমি করলাম, মানে ডি এন এ-এর কোনও কারেকশন করলাম না। তুই একজন স্বাভাবিক মানুষ হিসাবে জন্মালি।”

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে নয়ন। তার মুখ দিয়ে প্রায় কথা বেরচ্ছে না। ঠাকুরমার মুখে হালকা হাসি। মহীদাদু কিন্তু প্রায় নির্বিকার মুখে বললেন, “তোর কখনও মনে হয়নি নয়ন, এই যে তুই ফুল ভালবাসিস, বারান্দার টবে গাছ লাগাস, ছুটির দিনে জঙ্গলে বেড়াতে যাস, এরকম অভ্যেস তোর সমবয়সি কিংবা তার থেকে বড় অধিকাংশ মানুষের নেই?”

“হ্যাঁ, মনে হয়েছে। অবাকও লেগেছে। ছেলেবেলায় আমার স্কুলের বন্ধুদের এসব কথা বললে তারা বিরক্ত হত, বুঝতেও পারত না। তারপর তোমার বাড়িতে থাকার সময় তুমি আমাকে কিছু মজার জিনিস শিখিয়েছিলে। সেটা একদিন স্কুলে বলায় টিচার ভীষণ বকলেন। বললেন এই ধরনের আবোল-তাবোল কথা যেন একদম না বলি...”

“তোকে আমি কবিতা শিখিয়েছিলাম। গানও শিখিয়েছিলাম। হাতে রং-পেনসিল ধরিয়ে দিয়ে ছবি আঁকতেও বসিয়ে দিতাম। আমি তো তখন জানি যে, সারাজীবনে তোর আর এগুলো জানার কোনও সুযোগ হবে না। মানুষকে এগুলো ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এসবের অস্তিত্ব মুছে ফেলা হচ্ছে। পৃথিবীর সব মিউজ়িয়াম, লাইব্রেরি, সংগ্রহশালা একটু-একটু করে নিঃশব্দে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। আমি খুব অসহায় বোধ করতাম। আর সেজন্যই চেয়েছিলাম তোর যাতে অন্তত কিছু স্মৃতি থাকে, তাই শ্রীমতীর অপারেশনের সময় আমি তোকে নিজের কাছে এনে রাখি।”

“আমাদের সময় কিন্তু কমে আসছে, আর বড়জোর আধঘণ্টা কথা বলতে পারবে...” ঠাকুরমার কথা শুনে দ্রুত নিজের হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠে নয়ন বলে, “তুমি কেন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ, এবার সেটা আমি অনেকটা বুঝেছি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তুমি আমাকে কোনও দায়িত্ব দিতে চাও?”

“হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছিস। দায়িত্ব দিতে চাই বলেই তোকে ডেকে পাঠিয়েছি। দায়িত্ব দিতে হতে পারে ভেবেই তোর সঙ্গে এতদিন যোগাযোগ রাখিনি, যাতে তোর উপর কোনও সন্দেহ না পড়ে। আসলে নয়ন ওই কারেকশন হয়ে যাওয়া ডি এন এ-কে কী করে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়, সেই অ্যান্টিডোট আমি আবিষ্কার করে ফেলেছি। ডি এন এ-মূল কাঠামোটা তৈরি হয় যে উপাদান দিয়ে, তার সঙ্গে বিশেষ কিছু গাছের রস মিশিয়ে এটা তৈরি করা যায়।”

“তৈরি করা যায় কেন বলছ? তুমি তৈরি করোনি?”

“না, শেষ করতে পারিনি। কেন পারিনি সেটাও বলি তোকে। আমার গবেষণা যখন অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে, তখন একদিন পিউ থেকে আমাকে ডেকে পাঠায়। বুঝতেই পারছিস আমি যে কাজটা করছি, সে বিষয়ে পিউকে কিছু জানাইনি। ওরা অবশ্য কিছু সন্দেহও করেনি। তবে ততদিনে অন্য বিজ্ঞানীদের দিয়ে নানা রকম চেষ্টা-চরিত্র করে বুঝে গিয়েছে যে ডি এন এ-এর টুকরোকে ক্লোনিং করে অর্ডারমাফিক মানুষ বানিয়ে ফেলা খুব সহজ কাজ নয়। তাদের আশা, আমি কাজটা করতে পারব। তাই আমাকেই দায়িত্ব নিতে বলে। কিন্তু আমি তো জানি যে সেটা সম্ভব নয়। সেদিন সরাসরি পিউ-এর কর্মকর্তাদের সেটা জানিয়েও দিই। এর কিছুদিন পরেই জানতে পারি যে মুম্বই ছেড়ে আমাকে জুরান্তিতে চলে আসতে হবে। সুনের কথাগুলো আমার মনে ছিল। তাই ওরা অনেক রকম ভাল-ভাল কথা

বললেও আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমাকে নির্বাসনে পাঠানো হচ্ছে। এখানে কোনও রকম ল্যাবরেটরি থাকবে না সেটাও আন্দাজ করেছিলাম। তাই আমার মুম্বইয়ের গবেষণাগার থেকে খুব প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র লুকিয়ে নিয়ে এসেছিলাম। জুরান্তিতে আমি আর তোর ঠাকুরমা মিলে ছোট্ট একটা ল্যাবরেটরি তৈরি করে কাজ শুরু করে দিই। অসুবিধে অনেক ছিল। তাই সময় লেগেছিল। আবার এখানেই পাহাড়ের গায়ে এমন একটা লতার সন্ধান পেয়েছিলাম যেটা আমার কাজটা অনেক সহজও করে দিয়েছিল। সব মিলিয়ে কাজটা একদম শেষ পর্যায়ে এসে আটকে গেল...”

“কেন, আটকে গেল কেন?”

“তোকে বললাম না ডি এন এ যে উপাদানে তৈরি, সেটা আমার লাগবে। কিন্তু সেটা যে-কোনও মানুষের ডি এন এ হলে হবে না। একজন সত্যিকারের সৃষ্টিশীল মানুষের ডি এন এ দরকার। যে মানুষ একদম নতুন কিছু ভাবতে পারে, তৈরি করতে পারে। কিন্তু এরকম মানুষের ডি এন এ আমি জুরান্তিতে বসে পাব কোথায়?”

“আমার ডি এন এ দিয়ে কি তোমার কাজ চলবে দাদু?”

“না সোনা, চলবে না। তুমি যখন ছোট ছিলে তখনই আমি তোমার ডি এন এ পরীক্ষা করে দেখেছি। তুমি সুন্দর জিনিস ভালবাস, প্রকৃতি ভালবাস নিশ্চয়ই। কিন্তু তুমি শিল্পী নও।”

“তা হলে তুমি আমাকে কী করতে বলছ দাদু?”

“আমি তোকে একটা ক্যাপসুল দেব নয়ন। তাতে আমি যে অ্যান্টিডোটটা তৈরি করেছি, তার পুরো ফরমুলা লেখা আছে। তোর কাজ হবে একজন সত্যিকারের সৃষ্টিশীল মানুষকে খুঁজে বের করা। এটা যে খুব কঠিন কাজ, সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস। তারপর তার শরীর থেকে ডি এন এ সংগ্রহ করে তার সঙ্গে আমার দেওয়া ফরমুলা অনুযায়ী প্রত্যেকটা উপাদান মেশাতে হবে। আমি জানি তুই ল্যাবরেটরিতে যে ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করেছিস, তাতে এটাতে তোর কোনও অসুবিধে হবে না। এর পর হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তোদের ল্যাবরেটেরিতে সেখানে বাচ্চাদের নানা রকম ওষুধ তৈরি হয়। তার মধ্যে ‘নেভিটা’ নামের একটা ওষুধ আছে যেগুলো সব বাচ্চাই পাঁচ মাস বয়স পর্যন্ত খায়। তোর দায়িত্ব হবে এই কেমিক্যালটা ওই ওষুধটার মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া। সেটা যদি তুই করতে পারিস, তা হলে যেসব বাচ্চারা টানা পাঁচ মাস ওই ওষুধটা খাবে, তাদের ডি এন এ আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে, তারা স্বাভাবিক মানুষের মতো বড় হবে।”

নয়ন একটু চুপ করে থেকে বলে, “কাজটা খুবই কঠিন দাদু। তবে আমি চেষ্টা করব। আমার পক্ষে যতটা সম্ভব চেষ্টা করব নিশ্চয়ই।”

“দ্যাখ নয়ন, আরও একটা কথা তোর জেনে রাখা উচিত। আমি জানি পিউ-এর ক্ষমতা কী সাংঘাতিক, কত দূর পর্যন্ত তাদের হাত বিস্তৃত। ধরে নিলাম, তুই সবকিছু ঠিকঠাক করে শেষ পর্যন্ত ওষুধে কেমিক্যালটা মেশাতে পারলি। কিন্তু তার ফলে বাচ্চাগুলোর মধ্যে যে পরিবর্তনটা হবে সেটা কিন্তু পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যেই বোঝা যাবে। পিউ এটা নোটিস করবে না, সেটা হতে পারে না। কিন্তু ওদের কিছু করার থাকবে না। কারণ একশো বছরের বেশি বয়স হয়ে গেলে কোনও মানুষকে মেরে ফেলার ক্ষমতা পিউ-এর আছে। বাচ্চাদের মারার ক্ষমতা ওদের নেই। তাই ওরা চেষ্টা করবে বাচ্চাদের কেন এই বদলটা হচ্ছে তার কারণ খুঁজে বের করার। আমার ধারণা জাল গুটিয়ে এনে ওরা শেষপর্যন্ত তোকে ধরে ফেলবে। আর একবার যদি ধরতে পারে, তা হলে তুই যে আর স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারবি না, সে বিষয়ে আমার অন্তত কোনও সন্দেহ নেই। সেক্ষেত্রে নিজের জীবনের এমন একটা ঝুঁকি তুই নিবি কি না, ভাল করে ভেবে দ্যাখ। এক্ষেত্রে আমি তোকে জোর করতে পারি না দাদুভাই।”

“তোমাকে জোর করতে হবে না দাদু। আমি ঠিক করে ফেলেছি যে, কাজটা আমি করব। আমাকে করতেই হবে। এছাড়া আমার সামনে আর কোনও রাস্তা খোলা নেই।”

নয়নের কথায় মহীদাদুর মুখখানা জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে। বালিশের পাশ থেকে একটা ক্যাপসুলের থেকে একটু বড় জিনিস বের করে নয়নের হাতে দিয়ে বলেন, “এটা রেখে দে। ফরমুলা যেভাবে লিখে রেখেছি তাতে বুঝতে তোর অসুবিধে হবে না। তবে খুব সাবধান। কাজটা করবি, কিন্তু যতটা সম্ভব সাবধানে আর গোপনে।”

“দরকার হলে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি তো?”

“করতে পারিস। কিন্তু করিস না। তা হলে সন্দেহ হতে পারে। তা ছাড়া আমার ভরসা না করাই ভাল। জুরান্তিতে আসা আমাদের প্রায় আট বছর হয়ে গেল। শরীরে বিষ ঢোকানো কবে থেকে শুরু হয়েছে তো জানি না। মৃত্যু যে কোনওদিনই আসতে পারে। আমাদের কথা ভাবিস না। এখন নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। পিলুর সুইচ অন করার সময় হয়ে আসছে।”

মহীদাদুর বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর বেশ কয়েক মাস কেটে গিয়েছে। দাদুর দেওয়া ক্যাপসুলটা নয়ন খুব সাবধানে নিজের আলমারিতে তুলে রেখেছে। সেই আলমারি খুলতে হলে নানা রংয়ের লেসার রশ্মির যে কম্বিনেশন লাগে, সেটা নয়ন ছাড়া আর কেউ জানে না। তবে তার মধ্যেই একদিন সে নিজে রাতের খাওয়াদাওয়ার পর ভোলুকে সুইচড অফ করে ক্যাপসুলটা বের করে কম্পিউটারে ভরে দেখেছে। মহীদাদু খুব সহজ ভাষায় পুরো ফরমুলা বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মুশকিল হল কাজটা শুরু করতে হলে তো একজন শিল্পী মানুষের ডি এন এ লাগবে। সেরকম মানুষ নয়ন পাবে কোথায়?

মহীদাদু যখন কথাগুলো তাঁকে বলেছিলেন, তখন নয়ন অতটা বোঝেনি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে ওরকম কাউকে খুঁজে পাওয়া কতটা কঠিন। ডি এন এ কারেকশনের জন্য গত পঞ্চাশ বছরে এরকম মানুষ কেউ জন্মায়নি। তার থেকে বেশি বয়স যাঁদের, তাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু শিল্পী আছেন। কিন্তু তাঁদের খুঁজে পাওয়া যাবে কীভাবে? পিউ-এর পরিকল্পনা এত নিখুঁত যে বেশির ভাগ মানুষ এই ব্যাপারগুলোই ভুলে গিয়েছে। স্কুল-কলেজে শেখানো হয় না। এ সম্বন্ধে কোনও তথ্য ইন্টারনেটে পাওয়া যায় না। গান, গল্প, কবিতা এই শব্দগুলো শুনলে সবাই তাই ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। সত্যি কথা বলতে কী নয়নের নিজেরও তো ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। ছেলেবেলায় মহীদাদুর বাড়িতে যা শুনেছিল, সে তো ভুলেই গিয়েছে প্রায়। এরকম একটা ভাসা-ভাসা ধারণার উপর দাঁড়িয়ে সে কী করে এমন একজন মানুষকে খুঁজে বের করবে? চিনবে কী করে তাকে?

কিন্তু তবু নয়ন সহজে হাল ছাড়ার মানুষ নয়। মহীদাদুকে সে কথা দিয়েছে। তাই ইদানীং নয়ন প্রায় সব ছুটির দিনেই আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে বেড়াতে যায়। বিশেষ করে একশো-দেড়শো বছর বয়স হয়েছে, এমন সব মানুষ যে বাড়িতে আছেন। তাঁদের সঙ্গে অনেক গল্প হয়। পুরনো দিনের কথাও জানা যায়। শিল্পী কাকে বলে সেটা তাঁরা জানেন। দু’-এক জনের এসব বিষয়ে আগ্রহও আছে। কিন্তু তাঁদের ডি এন এ দিয়ে যে নয়নের প্রয়োজন মিটবে না, সেটা সে নিজেই বুঝতে পারে। দু’-একবার এঁদের কাছ থেকে গল্প শুনে একদম অচেনা মানুষের বাড়িতেও হানা দিয়েছে নয়ন। যেমন তার এক বন্ধুর ঠাকুরদা একজনের নাম বলেছিলেন, তিনি নাকি ভারী সুন্দর ছবি আঁকতেন। নয়ন অনেক খুঁজে তাঁর সন্ধানও বের করেছিল। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে জানা গেল সেই মহিলা বছরখানেক হল মারা গিয়েছেন। সেরকমই এক গায়কের সন্ধানে গিয়ে নয়ন জানতে পেরেছিল তিনি নাকি বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছেন। কোথায় গিয়েছেন কেউ জানে না। এভাবে শিল্পী মানুষ খুঁজতে-খুঁজতে নয়ন ক্রমশ বুঝতে পারছিল, নিজেদের লক্ষ্যে একদম পরিকল্পনামাফিক এগোচ্ছেন পিউ-এর কর্মকর্তারা। একদিকে শিল্পী জন্মাচ্ছে না। অন্যদিকে প্রবীণ শিল্পীরা হয় মারা যাচ্ছেন নয়তো হারিয়ে যাচ্ছেন।

মনে-মনে যখন বেশ খানিকটা হতাশ হয়ে পড়েছে নয়ন, সেই সময় একদিন সকালে মহীদাদুর মৃত্যুসংবাদ এল। সেদিনটা ছিল

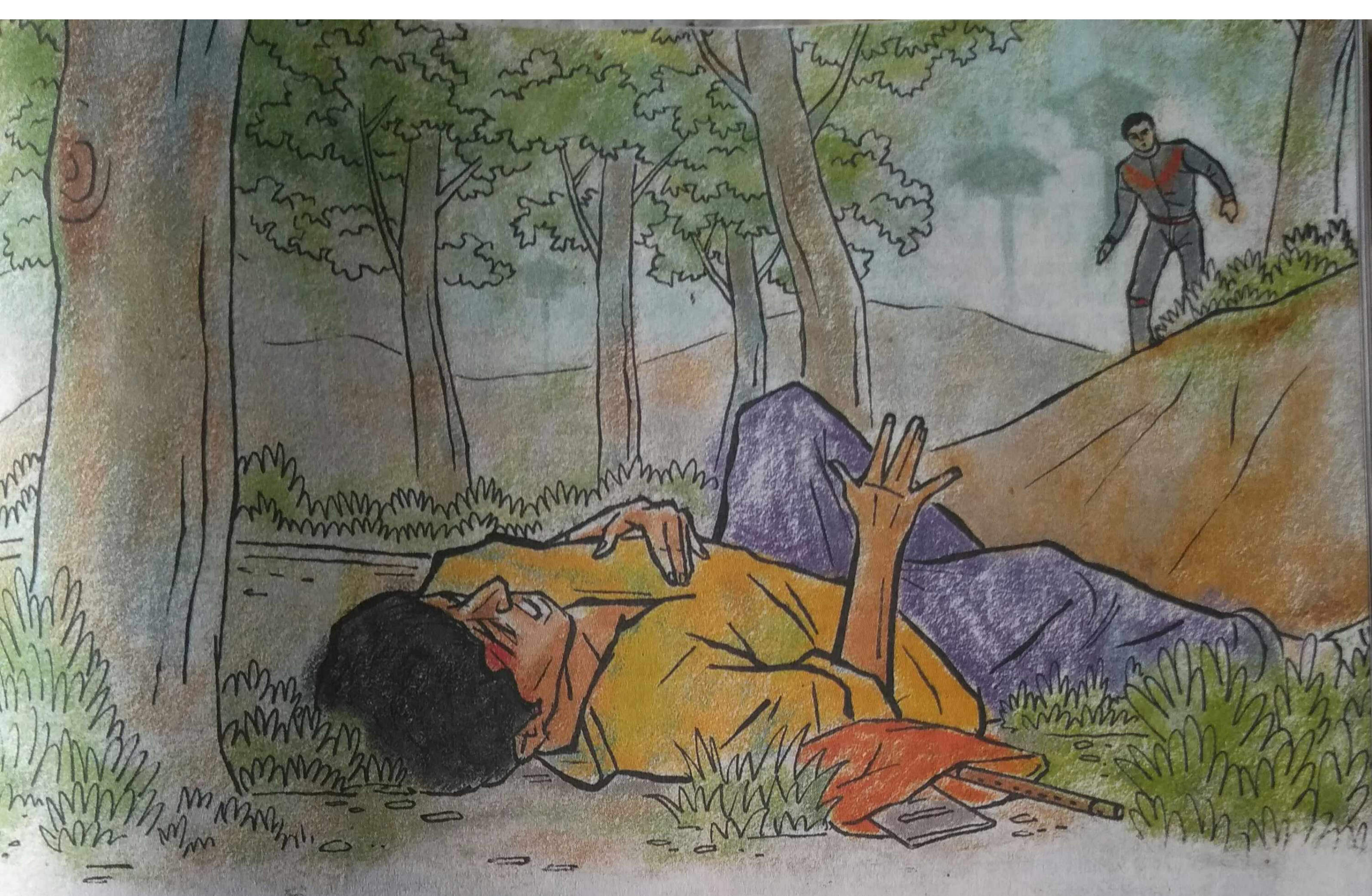

রবিবার। খবরটা শোনার পর থেকে কিছুই আর ভাল লাগছিল না নয়নের। নিজেকে খানিকটা শান্ত করার জন্যই অনেকদিন পর সে তার সুপারসনিক কার নিয়ে বেরিয়ে সোজা চলে গেল জঙ্গলে। সময়টা বসন্তকাল। গাছে-গাছে ঝলমল করছে নতুন পাতা। নানা রকম ফুল ফুটেছে। প্রজাপতিরা উড়ে বেড়াচ্ছে। অনেক রকম পাখিও ডাকছে। গাড়িটা একটা মোটামুটি ফাঁকা জায়গায় রেখে জঙ্গলের মধ্যে ঢোকে নয়ন। তারপর এদিকওদিক ঘুরতে-ঘুরতে একসময় একটা মোটা শিমুল গাছের তলায় ঘাসের উপর শুয়ে পড়ে।

ঠান্ডা হাওয়ায় যখন প্রায় চোখ লেগে এসেছে, তখন হঠাৎ একটা কীরকম অদ্ভুত শব্দ শুনে তার তন্দ্রা কেটে যায়। উঠে বসে এদিকওদিক তাকিয়ে কিছুই দেখতে পায় না। আওয়াজটা কিন্তু থামেনি। ভাল করে শুনে নয়ন বুঝতে পারে একটু দূরে একটা বুনো গোলাপের ঝোপের ওপাশ থেকে আসছে শব্দটা। তাড়াতাড়ি ঝোপটা পেরিয়ে উলটোদিকে গিয়েই চমকে ওঠে সে। মাটিতে একটা লোক পড়ে আছে। তার কপাল কেটে রক্ত পড়ছে। মানুষটার প্রায় অজ্ঞান অবস্থা। মুখ দিয়ে একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরচ্ছে, যেটা গাছতলায় শুয়ে সে শুনতে পেয়েছিল। লোকটির পাশে একটা ব্যাগ আর কিছু অদ্ভুত যন্ত্রপাতি পড়ে আছে। সেগুলো সম্ভবত ওই ব্যাগ থেকেই পড়ে গিয়েছে।

এরকম একটা জনশূন্য জায়গায় একজন মানুষকে পড়ে থাকতে দেখে প্রথমটায় খানিকটা হকচকিয়ে গিয়েছিল নয়ন। কিন্তু তারপরই নিজেকে সামলে নিয়ে সে দৌড়ে নিজের গাড়ি থেকে ওষুধপত্রের একটা ছোট বাক্স বের করে আনে। রক্ত বন্ধ করার জন্য কপালে মলম লাগায়। তারপর একটা বিশেষ ওষুধের কয়েক ফোঁটা লোকটির ঠোঁট ফাঁক করে মুখের মধ্যে ঢেলে দেয়। ওষুধটা মুখের ভিতরে যাওয়ার একটু পরেই লোকটার গোঁ গোঁ আওয়াজটা আস্তে-আস্তে কমে যায়। আরও একটু পরে নয়ন বুঝতে পারে যে, তার জ্ঞান ফিরে আসছে। তখন খুব সাবধানে তাকে তুলে ধীরে-ধীরে হাঁটিয়ে নিজের গাড়ির কাছে নিয়ে এসে গাড়িতে বসায়। তারপর গিয়ে সেই ব্যাগের মধ্যে যন্ত্রপাতিগুলো ভরে সেটাকেও তুলে নিয়ে আসে।

অচেনা মানুষটির কথা বলার মতো অবস্থা নেই। শরীরের ভিতরে কোনও ক্ষতি হয়েছে কি না কিংবা কী কষ্ট হচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তাই বাড়িতে না এসে নয়ন প্রথমেই তাকে নিয়ে যায় ডাক্তারের কাছে। তিনি ভাল করে পরীক্ষা করে বলেন যে চোট খুব গুরুতর নয় ঠিকই, কিন্তু মনে হচ্ছে কোনও কারণে শক পেয়েছে। তাই বেশি নড়াচড়া না করে বিশ্রামে রাখাই ভাল। একটু সামলে উঠলে তখন সব কিছু জেনে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া যাবে। ডাক্তারবাবু লোকটিকে হাসপাতালেই ভর্তি করে নিচ্ছিলেন। কিন্তু লোকটার জামাকাপড় বেশ অন্য রকম। ব্যাগের যন্ত্রপাতিগুলোও অদ্ভুত। সব মিলিয়ে মানুষটার সম্বন্ধে একটু কৌতূহল হচ্ছিল নয়নের। তা ছাড়া ও কেন জনহীন জঙ্গলে গিয়েছিল, সেটাও জানার ইচ্ছে ছিল। তাই সে ঠিক করে হাসপাতালে নয়, নিজের কাছেই রাখবে ওকে। যদি কোনও কারণে বেশি শরীর খারাপ হয়, তখন হাসপাতালের কথা ভাবা যাবে। নয়নের এমন অদ্ভুত প্রস্তাবে ডাক্তারবাবু একটু আশ্চর্য হলেও আপত্তি করেন না।

প্রায় তিন সপ্তাহ হয়ে গেল নীল নয়নের বাড়িতেই আছে। হ্যাঁ সেই অজানা লোকটির নাম নীল। সে নিজেই তার নামটা বলেছে, কিন্তু আর কিছুই বলতে পারেনি। প্রথম কয়েকদিন অবশ্য তার কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না। বেশির ভাগ সময়ই ওষুধের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। নয়নের নির্দেশ মতো তার সব দেখাশোনা করত ভোলু। কিন্তু আস্তে-আস্তে সে যখন সুস্থ হয়ে উঠছে, তখন তার সঙ্গে কথা বলে নয়ন বেশ আশ্চর্য হয়ে দেখল যে সে বাংলা, ইংরেজি এরকম বেশ কয়েকটা ভাষা দিব্যি বুঝতে পারছে। কিন্তু এসপারেন্তোতে কথা বললে কিছুই বুঝছে না। যেরকম নিজের নামটা বলতে পারছে কিন্তু আর কিছু, যেমন সে কোথায় থাকত, কী করত এসব তার মনে নেই।

ডাক্তারের সঙ্গে কথা বললে তিনি নীলের ব্রেন ম্যাপিং করতে বললেন। কিন্তু তাতেও বিশেষ কিছু বোঝা গেল না। তবে ডাক্তার বললেন অনেকসময় মাথায় আঘাত লেগে এরকম হতে পারে। সেটা ম্যাপিংয়ে সবসময় ধরা পড়ে না। যেহেতু কিছু জিনিস মনে পড়ছে,

কিছু পড়ছে না, তাই একটু অপেক্ষা করাই ভাল। স্বাভাবিকভাবে যদি স্মৃতিশক্তি ফিরে না আসে, তখন চিকিৎসা শুরু করা যাবে।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এরকম অসহায় অবস্থায় তো কোনও মানুষকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। তাই নীল নয়নের বাড়িতেই রয়েছে। তাতে অবশ্য নয়নের কোনও আপত্তি নেই। বরং সে বেশ খুশি। কারণ নীল মানুষটি ভারী ভাল। এমনিতে আপনমনে থাকে। কিন্তু নানা রকম মজার কথা বলে দিব্যি হাসাতে পারে। আবার ভারী সুন্দর করে গল্পও করে। নয়ন বুঝতে পারে যে নীল যথেষ্ট বুদ্ধিমান। কিন্তু মাথার আঘাত লাগার কারণেই সম্ভবত এক-এক সময় এমন সব কথাবার্তা বলে যে, শুনলে মনে হয় যেন সে অনেক পুরনো দিনের মানুষ। আজকের পৃথিবীর সম্বন্ধে তার কোনও ধারণাই নেই।

নীল নয়নের বাড়িতে থাকতে শুরু করার মাসছয়েক পরে একদিন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। নীলকে জঙ্গল থেকে তুলে আনার সময় নয়ন তার ব্যাগটাও তুলে এনেছিল। তারপর বাড়ি এসে ব্যাগটাকে সযত্নে ড্রয়ারের ভিতর ঢুকিয়েও রেখেছিল। কিন্তু তারপর নীলের অসুস্থতা, তাই নিয়ে নানা রকম দৌড়ঝাঁপ এসবের মাঝে সে ব্যাগটার কথা বেমালুম ভুলে যায়। নীলও ব্যাগের ব্যাপারে তার কাছে কিছু জানতে চায়নি। কিন্তু একদিন অফিসের কিছু কাগজপত্র বের করতে গিয়ে ড্রয়ারের ভিতর থেকে ব্যাগটা বেরিয়ে পড়ায় নয়ন তাড়াতাড়ি ব্যাগটা নিয়ে গিয়ে নীলের হাতে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে নীলের মুখটা যেন আনন্দে একেবারে উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, বলে, “এটা তুমি কোথায় পেলে নয়ন?”

“তুমি যেখানে পড়ে ছিলে, সেখানেই তো ছিল। যন্ত্রপাতিগুলো পাশে ছড়িয়ে ছিল। আমি সব গুছিয়ে ব্যাগের ভিতর ভরে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু তারপর তোমাকে নিয়ে এত টানাটানি শুরু হল যে ব্যাগের কথা ভুলেই গিয়েছি।”

নীল ব্যাগের ভিতরের জিনিসগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে থাকে। খুব আলতো করে একটা লম্বাটে পাইপের মতো জিনিসে হাত বোলায়। তার কাণ্ডকারখানা দেখে নয়ন ভারী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, “এটা কীসের যন্ত্র নীল?”

“এটা তো যন্ত্র নয়। তুমি এটা চেন না?”

নয়নকে মাথা নাড়তে দেখে নীলও ভারী আশ্চর্য হয়। তারপর বলে, “আচ্ছা দাঁড়াও। আজ রাতের খাবার খাওয়ার পর তোমাকে এর কেরামতি দেখাব।”

ভোলুর সঙ্গে নীলও আজকাল মাঝে-মাঝেই রান্নার কাজে হাত লাগায়। নয়নের জন্য নানা রকম পদ তৈরি করে। সেগুলো একেবারে অন্য রকম খেতে আর স্বাদও চমৎকার। নয়ন যেহেতু সারাদিন ব্যস্ত থাকে, তাই ডিনার টেবিলে দু'জনের অনেক গল্পও হয়। সব মিলিয়ে রাতের খাওয়াটা আজকাল নয়নের কাছে খুব উপভোগ্য একটা ব্যাপার। সেদিন রাতে কুড়মুড়ে করে আলুর খোসা ভেজেছিল নীল। নয়নের সেটা দারুণ পছন্দ হল। আনাজের খোসাও যে আবার এরকমভাবে খাওয়া যায়, সেটা তার জানাই ছিল না। খাওয়া শেষ হলে ভোলুকে সুইচড অফ করে চার্জে বসিয়ে দু'জনে এসে বসে নয়নের ঘরে।

ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে নীল সেই লম্বাটে পাইপের মতো জিনিসটা নিজের মুখের কাছে তুলে নিয়ে ফুঁ দেয়। আর অমনি তার থেকে একটা ভারী মিষ্টি শব্দ বেরতে থাকে। তেমন আওয়াজ নয়ন আগে কখনও শোনেনি। তার মনে হয় এই শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে তার মনটাও যেন কোন সুদূরে ভেসে যাচ্ছে। অনেকদিন পরে মায়ের মুখটা মনে পড়ে চোখে জল আসে আবার বুকের ভিতরটা কেমন যেন অন্য রকম আনন্দে ভরে ওঠে।

এক সময় শব্দ থামে। নয়ন দু'হাতে নীলকে জড়িয়ে ধরে বলে, “এটা কী নীল? এমন জিনিস তো আগে কখনও দেখিনি, এমন আওয়াজও কখনও শুনিনি।”

“এটাকে বলে বাঁশি। এটা এক ধরনের বাজনা। এটা বাজাতে হয়। এই যে ফাঁপা নলটা দেখছ, এর গায়ে ছোট-ছোট ফুটো আছে। আমি ফুঁ দিলে সেই হাওয়া এই ফুটো দিয়ে বেরিয়ে নানা রকম সুর তৈরি করে। তাকেই বলে বাজানো। কিন্তু আমার খুব আশ্চর্য লাগছে নয়ন, তুমি আগে কখনও বাঁশি দেখোনি?”

“না, সত্যিই দেখিনি। এমনকী এর নামও কখনও শুনিনি। কিন্তু তুমি এটা কোথা থেকে পেলে। আর বাজাতেই বা শিখলে কোথা থেকে?”

“আমি তো খুব ছেলেবেলা থেকেই বাঁশি বাজাতে জানি। কিন্তু কার কাছে শিখলাম, কীভাবে শিখলাম তা তো মনে করতে পারছি না। অথচ দ্যাখো সুরগুলো কিন্তু সব ঠিকঠাক মনে পড়ছে। তোমার যদি ভাল লাগে, তা হলে আমি তোমাকে মাঝে-মাঝেই বাঁশি বাজিয়ে শোনাব। চাইলে তোমাকে শেখাতেও পারি।”

নয়ন এবার একটু হেসে বলে, “শিখতে পারব কি না জানি না। শুনব তো নিশ্চয়ই। তবে একটা জিনিস খেয়াল রেখো, ভোলু যেন কিছু জানতে না পারে।”

“কেন বলো তো, ভোলু জানলে অসুবিধে কোথায়?”

“আমি যেমন কোনওদিন বাঁশি দেখিনি, সেরকম ভোলুও নিশ্চয়ই দেখেনি। একদম অজানা কিছু দেখলে, মানে যার সম্বন্ধে কোনও ডেটা ওকে ফিড করা হয়নি, ও সঙ্গে-সঙ্গে সেটা মনিটর করে আর তার রিপোর্টও তৈরি করে। সেই রিপোর্ট সরকারের ঘরে জমা পড়লেই সেখান থেকে লোক আসবে তোমার আর তোমার বাঁশির খোঁজখবর নিতে। তখন কোথা থেকে তুমি বাঁশি পেলে, কেন তোমাকে আমি হাসপাতালে না দিয়ে নিজের বাড়িতে রেখেছি, এইসব নানা প্রশ্ন উঠে জলঘোলা হবে। তাই ওসব ঝামেলায় না যাওয়াই ভাল।”

নয়নের কথার ধরনে হেসে ফেলে নীল। তারপর বলে, “আচ্ছা ঠিক আছে। ভোলু বাদ। আমরা দুই বন্ধুই শুধু বাঁশি শুনব। ব্যস, তা হলে খুশি তো?”

“খুব খুশি। তবে সবচেয়ে বেশি খুশি হলাম তুমি আমাকে বন্ধু বলায়। তুমি আসার আগে আমার কিন্তু সেরকম কোনও বন্ধুই ছিল না। অথচ দ্যাখো তোমার সঙ্গে কত তাড়াতাড়ি ভাব হয়ে গিয়েছে। আজকাল তো আমার মাঝে-মাঝে মনে হয়, তোমার যখন সব কথা মনে পড়ে যাবে আর তুমি নিজের বাড়িতে চলে যাবে, তখন তো আমি ভারী বিপদে পড়ে যাব।”

“আরে চিন্তা করছ কেন? আমি যখন নিজের বাড়িতে যাব, তখন তোমাকেও আমার সঙ্গে নিয়ে যাব!” হাসতে-হাসতে বলে ওঠে নীল।

তারপর থেকে মাঝে-মাঝেই রাতে নয়নকে বাঁশি বাজিয়ে শোনায় নীল। তার সঙ্গে থাকতে-থাকতে নয়ন ধীরে-ধীরে বুঝতে পারে শুধু বাঁশি বাজানো নয়, আরও অনেক কিছুই নীল করতে পারে, যেগুলো তার সম্পূর্ণ অজানা।

যেরকম একদিন নীল স্নানে ঢোকার পর নয়ন শুনতে পায় স্নানঘরের ভিতর থেকে একটা গুনগুন আওয়াজ আসছে। আওয়াজের ধরনটা নয়নের খানিকটা চেনা। কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছে না। তাই নীল স্নান সেরে বেরনোমাত্র নয়ন তাকে চেপে ধরে, “বাথরুমে তুমি কী করছিলে বলো তো?”

“বাথরুমে আবার কী করব! স্নান করছিলাম...” নীল তো অবাক।

“না, না, তা নয়। একটা অন্য রকম আওয়াজ আসছিল তো...”

“ও, সে তো আমি গান গাইছিলাম।”

মহীদাদুর কল্যাণে গান ব্যাপারটা নয়ন কিছুটা জানে। তাই বাঁশির মতো অতটা হতবাক হয়ে যায় না। বরং নিজেকে একটু সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, “তুমি কি গান গাইতে পার?”

“অল্প-অল্প পারি। খুব ভাল বোধ হয় নয়। যদিও একসময় লোকে খুবই ভাল বলত।”

“কারা ভাল বলত? তোমার মনে আছে তাদের কথা?”

কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মাথা নাড়ে নীল, “নাহ মনে নেই। মনে পড়ছে না। গানগুলো কিন্তু মনে আছে। গান গাইতে গেলে

আমার কোনওদিন একটা শব্দও ভুল হয় না।”

সামান্য হতাশ হয়ে নয়ন বলে, “আচ্ছা, একটা গানই শোনাও তা হলে।”

“উঁহু, এখন নয়। তুমি বলেছ না, ভোলুর সামনে নতুন কিছু না করতে। গান তোমাকে আমি রাতে শোনাব, ভোলুকে সুইচড অফ করার পর।”

দিনগুলো আজকাল ভারী ভাল কাটছে নয়নের। রোজ রাতে ভোলুকে সুইচ টিপে ঘুম পাড়ানোর পর বসে তাদের দুই বন্ধুর আসর। কোনওদিন নীল বাঁশি বাজিয়ে শোনায়। কোনওদিন গান গায়। নীলের কাছে শুনে-শুনে আজকাল একটু-একটু গান গাইতে পারে নয়নও। নীল বলেছে, নয়নের গলায় নাকি সুর আছে। একটু চেষ্টা করলেই সে পারবে। এই সুর ব্যাপারটা যে কী, সেটা অবশ্য নয়নের মাথায় ঢোকেনি। নীলও তাকে ঠিকমতো বোঝাতে পারেনি। কিন্তু সুরটা এখন চিনতে শিখেছে নয়ন। গলার আওয়াজটা ঠিক কেমনভাবে বেরলে সেটা সুরে বলা হয়, সেটা এখন সে বুঝতে পারে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আজকাল নীলের মতো তারও খানিকটা গুনগুন করা অভ্যেস হয়েছে। দু’-একদিন অফিসে কাজ করার সময় আপনমনে গুনগুন করায় সহকর্মীরা ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল। নয়ন সেটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু তারপর একদিন বস ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার কি কোনও মানসিক সমস্যা হচ্ছে? মানে কোনও ধরনের অসুবিধে বা চাপ, তা হলে সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় তোমার ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা দরকার।”

নয়ন তো অবাক, বলেছিল, “কেন স্যার? আমার তো সেরকম কিছু মনে হয়নি।”

“তোমার কলিগরা বলছিল, তুমি নাকি আজকাল মাঝে-মাঝে নিজের মনে কথা বলো, অদ্ভুত ধরনের আওয়াজ করে কথা বলো...”

অনেক কষ্টে সেদিন ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়েছিল নয়ন। কিন্তু তারপর থেকে সতর্ক হয়ে গিয়েছে, কোনওভাবেই যেন কাজের সময় এককলি গানও গুনগুনিয়ে মুখ থেকে বেরিয়ে না আসে। কিন্তু নয়নের কাছে কথাটা শুনে খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল নীল, “কেন, গান করাটা তো অন্যায় কাজ নয়। ভারী সুন্দর একটা জিনিস। সেটা নিয়ে তোমাদের এত ভয়, এত লুকোছাপা কীসের? তোমার মতো ওরাও তো শিখে নিতে পারে। তা হলে ওদেরও ভাল লাগবে। নতুন কিছু শিখতে তো সবসময়ই ভাল লাগে।”

নীলের প্রশ্নের কোনও উত্তর দেয়নি নয়ন। কারণ পিউ-এর কার্যকলাপ, যা সে নিজে মহীদাদুর কাছ থেকে শুনেছে সেগুলো তো আর নয়নকে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু নিজের মনে-মনে ভারী আশ্চর্য হয়েছিল। নীলের বয়স প্রায় তার সমান। তা হলে তো তারও নিশ্চয়ই ডি এন এ কারেকশন হয়েছে। তা হলে সে কী করে এত অন্য রকম! নয়নের মতো তারও কি কোনও মহীদাদু ছিল? নাকি পিউ যে অল্প কিছু হাতে গোনা শিশুর ডি এন এ কারেকশন করে না, যারা বড় হয় পৃথিবীকে শাসন করার অধিকার নিয়ে, নীল তাদের মধ্যে একজন। তা হলে তো নয়নের আরও বেশি সাবধান হওয়া দরকার। কারণ নিয়মিত চিকিৎসা চলছে। কোনও একটা সময় তো নীলের স্মৃতি ফিরে আসবেই। এখন নয়ন কোনও বেফাঁস কথা বললে তখন তো বিপদে পড়ে যাবে।

কিন্তু এতসব নানা রকম যুক্তি সত্ত্বেও, নয়ন কিন্তু নিজের মনে-মনে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না যে, নীল আসলে পিউ-এর বিশ্ব জুড়ে পেতে রাখা ষড়যন্ত্রের জালেরই একটা অংশ। নীলের সহজ হাসি, খোলামেলা কথা সবই তার ওই যুক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। কিন্তু তা যদি না হয়, তা হলে নীল কেন এত অন্য রকম তারও কোনও ব্যাখ্যা সে খুঁজে পায় না। তাই নীলকে নিয়ে সারাক্ষণই তার মধ্যে একটা দোলাচল চলে।

এমনিতে নীল এখন পুরোপুরি সুস্থ। তাই মাঝে-মাঝেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এদিকওদিক যায়। আবার নিজে-নিজে রাস্তা চিনে দিব্যি ফিরেও আসতে পারে। কেমন করে এয়ারক্যাব ডাকতে হয়, সেটা নয়ন তাকে শিখিয়ে দিয়েছে। নীল সাধারণত তাদের সাড়ে তিনশোতলার ব্যালকনিতে এয়ারক্যাব ডেকে নেয়। তারপর তাতে চেপে চলে যায় নিজের পছন্দমতো জায়গায়। পছন্দমতো জায়গা বলাটা অবশ্য ভুল। সারা শহর জুড়ে যেসব অসংখ্য শপিং মল, নকল পাহাড়, নদী, সমুদ্দুর, মরুভূমি সাজানো আছে, সেসব কিছুই নীলের পছন্দ হয় না। তার সবচেয়ে ভাল লাগে ছুটির দিনে নয়নের সঙ্গে জঙ্গলে বেড়াতে যেতে, সত্যিকারের ঝরনার জলে পা ডুবিয়ে বসতে। কিন্তু তবু নয়ন তাকে বেরতে বলে। কারণ প্রথমত, চারদিকটা চেনা দরকার। আর নানা জায়গায় ঘুরতে-ঘুরতে কোনও কিছু দেখে নীলের পুরনো কথা মনে পড়েও যেতে পারে। যদিও এখনও পর্যন্ত সেরকম কোনও সম্ভাবনা দেখা যায়নি। বরং প্রতিদিনই বাইরে থেকে ঘুরে এসে নীল নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করে নকল পাহাড়, নদী দেখে দর্শকদের উচ্ছ্বাসের বর্ণনা দেয়। আর সেগুলো শুনতে-শুনতে হেসে গড়িয়ে পড়ে নয়ন।

নীল দু’-একবার নয়নকে জিজ্ঞেসও করেছে, “এই মানুষগুলোর কখনও ইচ্ছে হয় না আসল পাহাড়, সমুদ্র কেমন হয়, গিয়ে দেখে আসতে? নতুন জায়গায় গিয়ে সেটাকে আবিষ্কার করতে ভাল লাগে না এদের?”

আরও অনেক কিছুর মতোই, নীলের এই প্রশ্নেরও কোনও উত্তর দেয়নি নয়ন। যদিও তার নিজের মনে অন্য আর-একটা প্রশ্ন বেশ কিছুদিন ধরেই উঁকিঝুঁকি মারছিল। নয়নের বাড়িতে নীলের থাকা প্রায় এক বছর হতে চলল। ইতিমধ্যে তার মাথার চিকিৎসাও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ডাক্তারবাবুর ধারণা আর অল্পদিনের মধ্যেই নীলের সম্পূর্ণ স্মৃতি ফিরে আসবে। যদিও দুই বন্ধুর কেউই সেটা নিয়ে বিশেষ ভাবিত নয়। আর ভোলুর স্টোরেজে যেহেতু এরকম পরিস্থিতি নিয়ে কোনও তথ্য ফিড করা নেই, তাই এবিষয়ে তার কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্কও খালি। সুতরাং নীলকে নিয়ে ভোলুর কোনও মাথাব্যথা, কিংবা বলা ভাল কম্পিউটার-ব্যথা নেই। অতএব সবকিছু চলছিল ভালই। কিন্তু সেদিন ঘটে গেল একটা সাংঘাতিক ঘটনা।

রোজকার মতো সকালবেলা নয়ন নিজের ল্যাবরেটরিতে মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে। হঠাৎ তার হাতের ব্যান্ডে বিপ-বিপ শব্দ করে সবুজ রংয়ের আলোর সংকেত আসতে শুরু করল। নয়ন বুঝতে পারল অচেনা কেউ তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে, এমন কেউ যার সঙ্গে মনোবাহীতে তার যোগাযোগ নেই। বাটন টিপে ব্যান্ড চালু করে নয়ন তো অবাক। উলটোদিকে রয়েছেন পুলিশের একজন অফিসার। নীল নাকি রাস্তায় কী গন্ডগোল করেছে, তাই তাকে তাঁরা নিজেদের অফিসে নিয়ে এসেছেন। নীল নিজের সম্বন্ধে কিছুই বলেনি, শুধু নয়নের নাম আর ব্যান্ড নম্বর দিয়েছে। তাই পুলিশ অফিসার নয়নের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন।

সব কথা শুনে নয়ন বুঝতে পারে যে, ব্যাপারটা ঠিক সুবিধেজনক নয়। তাই বসের সঙ্গে কথা বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে হাজির হয় পুলিশের অফিসে। নীল সেখানেই রয়েছে। তবে পুরো ঘটনায় পুলিশ অফিসার যে রীতিমতো হতভম্ব, সেটা বুঝতে নয়নের অসুবিধে হয় না। ঘটনাটা যদিও খুবই সামান্য। সেদিন সকালে নয়ন বেরিয়ে যাওয়ার পর নীলও একটা ক্যাব ডেকে বেরিয়েছিল। কিছুক্ষণ এদিকওদিক ঘোরাঘুরির পর তার ইচ্ছে হয় মাটিতে হাঁটবে। ইদানীং অধিকাংশ মানুষ যেহেতু আকাশপথেই চলাফেরা করে, তাই রাস্তাঘাট প্রায় শুনশান থাকে। নীল আপনমনে ওরকম একটা ফাঁকা রাস্তায় হাঁটছিল।

এমন সময় সে দেখে যে, একটা জায়গায় রাস্তার পাশে সার-সার রংচঙে পাথর বসানোর কাজ চলছে। পাথরগুলো দেখতে সুন্দর, রাস্তাটাকে দেখাচ্ছেও ভাল। কিন্তু এই পাথর বসানোর জন্য মিস্ত্রিরা একটা ঝলমলে হলুদ ফুলে ভরা গাছকে উপড়ে ফেলবে ঠিক করেছে। সেজন্য মাটি খোঁড়ার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। নীল নাকি

লোকগুলোকে গিয়ে বলে যে, গাছটা না উপড়ে ফেলে পাথর বসালে সেটা আরও সুন্দর দেখাবে। লোকগুলো স্বাভাবিকভাবেই তার কথায় রাজি হয়নি। তখন নীল গাছটাকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে বসে পড়ে। হতভম্ব মিস্ত্রিরা পুলিশে খবর দেয়।

পুলিশও ঘটনা দেখে অবাক। তবে তারা অনেক কষ্টে বুঝিয়েসুজিয়ে নীলকে সেখান থেকে তুলে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে এসেছেন। যদিও নীল নাকি তাদের ভয় দেখিয়েছে যে, কাল যদি সে গিয়ে দ্যাখে যে গাছ উপড়ে ফেলা হয়েছে, তা হলে ওখানেই মাটিতে শুয়ে থাকবে যতক্ষণ না আবার গাছটাকে ফিরিয়ে এনে পোঁতা হয়। ভয় পেয়ে মিস্ত্রিরা কাজ বন্ধ করে রেখেছে। পুলিশও ভেবে পাচ্ছে না কী করবে। কারণ এমন ধরনের কথাবার্তা তারা কস্মিনকালেও শোনেনি।

“উনি কি অসুস্থ? চিন্তাভাবনা ঠিকমতো করতে পারেন না?”

পুলিশ অফিসারের প্রশ্নের উত্তরে নয়ন জানায় যে, তাঁর অনুমান সঠিক। বছরখানেক আগে নীলের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। সে এখনও পুরো সেরে ওঠেনি। তাই তার চিন্তার সূত্রগুলো একটু এলোমেলো।

“আমারও সেরকমই মনে হয়েছিল। তবে চিন্তাগুলো এলোমেলো নয়, খুবই অদ্ভুত। উনি বলছেন যে গাছটাকে উনি মেরে ফেলতে দেবেন না। এ আবার কী ধরনের কথা! এরকম কী বলা যায় না কি! রাস্তাটা সাজানো হচ্ছে, তাই গাছটাকে সরিয়ে দিতে হবে। এটাই তো নিয়ম। অথচ উনি সেটা মানতে চাইছেন না। আমার মনে হচ্ছে ওঁর অসুখটা বেশ জটিল। আপনি ডাক্তারকে এই ঘটনাটা বলবেন নিশ্চয়ই। দরকার হলে আমাকেও ডাকতে পারেন। আমি চাই যে উনি দ্রুত সেরে উঠুন।”

পুলিশ অফিসারের সব কথায় সায় দিয়ে ঘাড় নাড়ে নয়ন, যাতে কোনওভাবেই ঘটনাটা আর না গড়ায়। তারপর নীলকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু দুশ্চিন্তাটা যায় না। তাই বাড়ি ফিরে চুপচাপ শুয়ে পড়ে। এদিকে নীলও রাস্তায় প্রায় কোনও কথাবার্তা বলেনি। ফিরে এসে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করেছে। সারাদিন এভাবেই যায়। তারপর রাতের খাওয়াদাওয়া হলে ভোলুকে সুইচড অফ করে নীল নয়নকে বলে, “আমার জন্য তোমার আজ খুব টেনশন গিয়েছে। হেনস্থাও হতে হয়েছে বেশ খানিকটা। সেজন্য আমি ঠিক করেছি তোমাকে আজ একটা উপহার দেব। তুমি ঘরে গিয়ে বোসো, আমি আসছি।”

একটু আশ্চর্য হয়ে নিজের ঘরে চলে যায় নয়ন। একটু পরে হাতে একটা বড় সবুজ রংয়ের বোর্ড নিয়ে নীল ঢোকে। বোর্ডটা নয়ন চেনে। একটা বড় বাক্সে কতগুলো জিনিস আনা হয়েছিল। সেই বাক্সেরই একটা টুকরো ওটা। কিন্তু নীল যখন আস্তে-আস্তে বোর্ডটা তার দিকে ঘোরায় তখন সাংঘাতিক চমকে ওঠে নয়ন। গত সপ্তাহেই তারা দু'জনে ছুটির দিনে জঙ্গলের ধারে বসে সূর্যাস্ত দেখেছিল। গাছপালার আড়ালে টুকটুকে লাল সূর্য। ঘরে ফিরছে পাখির ঝাঁক। সেইসবই যেন কী করে উঠে এসেছে বোর্ডের গায়ে।

“এটা কী?” অবাক হয়ে জানতে চায় নয়ন।

“একে বলে ছবি। আমি এঁকেছি তোমার জন্য। তুমি চিনতে পারছ? এগুলো আমরা দেখেছিলাম সেদিন। তুমি আগে কখনও ছবি দেখেছ?”

আস্তে-আস্তে মাথা নাড়ে নয়ন, “চিনতে পেরেছি। জঙ্গলের ধারে বসেছিলাম আমরা দু'জনে। জান নীল, আমার মনে পড়ছে খুব ছেলেবেলায় আমি ছবি দেখেছি। মহীদাদুর বাড়িতে। কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম। ছবি কী করে তৈরি হয়, তাও জানি না। তুমি এটা তৈরি করলে কী করে?”

“তৈরি করা নয়, একে বলে আঁকা। এর জন্য রং লাগে আর তুলি। সেসব তোমাদের এখানে পাওয়া যায় না। আমি অনেক খুঁজেছি। কিন্তু কিছুদিন ধরেই ছবি আঁকতে বড্ড ইচ্ছে করছিল। তাই ঠিক করলাম নিজেই বানিয়ে নেব। জঙ্গল থেকে কাঠবিড়ালির লেজের লোম তুলে এনেছিলাম। তাই দিয়ে প্রথমে তুলি বানালাম। তারপর ভোলুর রান্নাঘর হাঁটকে নানা রংয়ের মশলা জোগাড় করে গুলে নিলাম। কিন্তু ছবিটা তোমার ভাল লেগেছে নয়ন?”

নীলের কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনছিল না নয়ন। কারণ তার মাথার মধ্যে তখন ঘুরপাক খাচ্ছে অন্য চিন্তা। তাই খানিকটা অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ে প্রথমটায়, তারপর কেমন যেন অদ্ভুত চোখে নীলের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, “তোমাকে আজ কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব, তুমি আমাকে সত্যি কথা বলবে তো?”

“নিশ্চয়ই বলব। তুমি আমার বন্ধু নয়ন। আমি কখনও বন্ধুকে মিথ্যে বলি না।”

“তুমি কি সত্যিই সব ভুলে গিয়েছ নীল? তোমার পরিচয় কিচ্ছুটি মনে নেই?”

ধীরে-ধীরে মাথা নাড়ে নীল, “না, আমি কিছুই ভুলে যাইনি। এতদিন তোমাদের সবাইকে যা বলে এসেছি, সেটা সত্যি কথা নয়।”

“তা হলে তুমি কে?”

“সেটা আমি তোমাকে এক্ষুনি বলতে পারব না নয়ন। তবে এটুকু বলতে পারি, আমার থেকে তোমার কোনও ভয় নেই। আমি তোমার কোনও ক্ষতি করব না। সত্যি কথা বলতে কী, কারও কোনও ক্ষতি করতেই আমি চাই না, করার ক্ষমতাও আমার নেই। তবে তুমি যদি আমার কাছে কোনও সাহায্য চাও, আমি চেষ্টা করব সেটা করতে।”

নয়ন যেন দু'-এক মুহূর্ত কী ভাবে। তারপর নীলের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, “নীল তুমি কি একজন শিল্পী?”

“হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি একজন আপাদমস্তক শিল্পী মানুষ।”

“কী করে এত নিশ্চিত হচ্ছ তুমি?”

“আমি শিল্পী বলেই তো তোমার আশপাশে যারা আছে, তাদের থেকে আমি এতটা আলাদা। তোমরা যেটা ভাবতেই পার না, তোমাদের স্কুল, কলেজ, বই, খাতা কোথাও যা নেই, তা আমি অনায়াসে করে ফেলি। কিন্তু শিল্পীর কথা তুমি কোথায় শুনলে নয়ন? তুমি কেন শিল্পীর খোঁজ করছ?”

“আমার যে একজন শিল্পীকে বড্ড দরকার...”

সেদিন প্রায় সারারাত জেগে মহীদাদুর কাছে শোনা সব কথা নীলকে খুলে বলে নয়ন। শুনতে-শুনতে কখনও রাগে মুখ শক্ত হয়ে যায় নীলের। কখনও দু'চোখ উপচে জল পড়ে।

নীলের শরীরের কোষ থেকে ডি এন এ সংগ্রহ করেছে নয়ন। মহীদাদুর ফরমুলা অনুযায়ী বাকি আর সব উপাদানও জোগাড় করা হয়েছে। এবার সবকিছু মাপমতো মিশিয়ে অ্যান্টিডোট তৈরি করতে হবে। মুশকিল হচ্ছে নয়নের নিজের বাড়িতে কোনও ল্যাবরেটরি নেই। তার কাজের জায়গায় যদিও খুব উন্নতমানের ল্যাবরেটরি আছে। কিন্তু সেখানে নিজের মতো কিছু করাটা একটু বিপজ্জনক। যদিও নয়ন নিজে যেখানে কাজ করে, সেটা একেবারেই তার নিজের দখলে আর তাকে সন্দেহ করারও কোনও কারণ নেই, কিন্তু তবু সাবধান হওয়াই ভাল।

সবদিক বিবেচনা করে নীলই বুদ্ধি দেয় নয়নকে, “তুমি বসকে জানাও যে, একটু নতুন ধরনের ওষুধ তৈরির চেষ্টা করছ। সেজন্য আপাতত কিছুদিন তোমাকে একটু বেশি সময় ল্যাবরেটরিতে থাকতে হবে। আমার মনে হয় অনুমতি পেতে অসুবিধে হবে না। বিকেলের পর ল্যাবরেটরি যখন ফাঁকা হয়ে যাবে তখন নিজের কাজ করবে।”

বুদ্ধিটা মনে ধরে নয়নের। তবে একটু হেসে বলে, “বস যদি পরে জানতে চায় কাজ কতটা এগোল তখন?”

“তখন বলবে এখনও তেমন কিছু এগোয়নি। কয়েকটা জায়গায় মনে হচ্ছে ভুল হয়েছে। আবার নতুন করে করছি। তবে আমার মনে হয় না কিছু জিজ্ঞেস করবে। তোমার বসের নিজে থেকে অত চিন্তা করার ক্ষমতাই নেই। উপরওয়ালারা কেউ না বললে খোঁজও নেবে না।”

বন্ধুর কথামতোই এগোয় নয়ন। প্রথমে কয়েকদিন একটু বেশি রাত পর্যন্ত ল্যাবরেটরিতে কাজ করে বোঝার চেষ্টা করে কেউ তার উপর নজর রাখছে কি না। কিন্তু সেরকম কিছু চোখে না পড়ায় একটু-একটু করে সব উপাদানগুলো নিয়ে গিয়ে ল্যাবরেটরিতে গুছিয়ে রাখে। তারপর একদিন সবার অলক্ষে শুরু হয়ে যায় অ্যান্টিডোট তৈরির কাজ। ফরমুলা অনুযায়ী সব কিছু করতে সময় লাগে প্রায় দু'সপ্তাহ। অ্যান্টিডোট তৈরি হওয়ার পর এবার সেটাকে মেশাতে হবে ট্যাবলেটের সঙ্গে। সে কাজটা বেশ কঠিন। কারণ ট্যাবলেটের অন্যান্য উপাদানগুলো যেখানে মেশানো হয়, সেখানে অনেক লোক কাজ করে। তা ছাড়া সেটা নয়নের নিজস্ব এলাকাও নয়। তাই ঘনঘন সেখানে গেলে সেটা চোখে পড়বেই।

নয়ন তাই প্রথমে ট্যাবলেট তৈরির পদ্ধতিটা সম্বন্ধে ভাল করে খোঁজ নেয়। ট্যাবলেটগুলো তৈরি হয় পরপর অনেক ধাপে। বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন উপাদান মাপমতো মেশানো হয়। তারপর একটা ফাইনাল মিক্সিংয়ের পর বাইরের কোটিংটা দিয়ে ফয়েলের ভিতর ভরে ফেলা হয়। সবটা জানার পর নয়ন ঠিক করে একেবারে ওই ফাইনাল স্টেজেই অ্যান্টিডোট মেশাবে সে। একটা সুবিধে আছে, ফাইনাল স্টেজের কাজটা যার তত্ত্বাবধানে হয়, সেই হেনরি বার্টের সঙ্গে নয়নের ভাল রকম পরিচয় আছে। তাই কথাবার্তা বলার অছিলায় ওখানে যাওয়া যাবে। আর দ্বিতীয়ত, সেটা হল ওই ফাইনাল স্টেজের পর আর কোনও টেস্টিং হয় না। আগের প্রতিটি ধাপেই মিক্সিংয়ের পর একবার করে টেস্ট করা হয়। সুতরাং এই স্টেজেই অ্যান্টিডোট মেশানোটা সবচেয়ে নিরাপদ। নয়ন খোঁজ নিয়ে আরও একটা জিনিস জানতে পারে যে, এই ফাইনাল মিক্সিংটা হয় মাসে একবার। দিনটাও নির্দিষ্ট। প্রতিমাসের তৃতীয় বুধবার হেনরির তত্ত্বাবধানে এই কাজটা চলে। ট্যাবলেট ফয়েলে প্যাকিংয়ের জন্য চলে যায় শুক্রবার।

একদম প্ল্যানমাফিক, সেই মাসের তৃতীয় বুধবারের প্রায় এক সপ্তাহ আগে নয়ন একদিন হেনরির ঘরে যায়। তার সঙ্গে নানা রকম গল্পটল্প করে জানায়, যে একটা নতুন প্রজেক্টের জন্য এই ট্যাবলেট তৈরির পদ্ধতিটা সম্বন্ধে তার জানা দরকার। কিন্তু যেহেতু তাদের ল্যাবরেটরির কাজের সঙ্গে এটার কোনও যোগ নেই, তাই হেনরি যদি তাকে সাহায্য করে তা হলে তার খুব উপকার হবে। আপত্তির কোনও কারণ নেই। হেনরি রাজি হয়ে যায় আর নয়নও মাসের তৃতীয় বুধবারে অ্যান্টিডেটের খুদি-খুদি ক্যাপসুলে ভরা শিশিটা জামার মধ্যে ভরে নিয়ে হাজির হয় হেনরির ঘরে।

ফাইনাল মিক্সিংয়ের কাজ চলছে। স্বাভাবিকভাবেই হেনরি সেদিন একটু ব্যস্ত। তাই নয়ন তাকে বলে, "তুমি তোমার কাজ করো। আমি বরং আজ একটু পুরো ব্যাপারটা ঘুরে দেখি।"

হেনরি খুশি হয়ে মাথা নেড়ে নিজের কাজে চলে যেতেই নয়ন এদিকসেদিক ঘুরতে ঘুরতে হাজির হয় ফাইনাল মিক্সিংয়ের মস্ত কন্টেনারের কাছে। তারপর খুব সতর্কভাবে চারদিকটা দেখে নিয়ে অ্যান্টিডোটের ক্যাপসুলগুলো তার মধ্যে ফেলে দেয়। কন্টেনারের মধ্যে অটোমেশনে সব উপাদান খুব দ্রুত মেশানোর কাজ চলছে। তাই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ক্যাপসুলগুলো গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে মিশে যায়। সেগুলোকে আলাদা করে চেনার আর কোনও উপায়ই থাকে না।

পুরো কাজটা করে ফেলার পর বুকের ধড়ফড়ানি একটু কমলে নয়ন যতখানি সম্ভব স্বাভাবিক মুখে হেনরির টেবিলের কাছে এসে দেখে যে হেনরি ততক্ষণে ফিরে এসেছে, "কোথায় ছিলে তুমি? একটু সময় পাওয়া গিয়েছে। চলো একসঙ্গে দু'কাপ কফি খেয়ে নেওয়া যাক।"

কফির মাগটা নয়নের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে হেনরি। নয়নের তো অনেকক্ষণ ধরেই গলা-বুক শুকিয়ে কাঠ। তাই গরম কফির কাপে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে খানিকটা ধাতস্থ হয়ে বলে, "আচ্ছা হেনরি, এই যে মিক্সিং হচ্ছে এর থেকে কত ওষুধ তৈরি হবে?"

"বাচ্চাদের এই ট্যাবলেটগুলো তো খুবই ছোট-ছোট। একটা মিক্সিং কন্টেনার থেকে মোটামুটি দশ লক্ষ ট্যাবলেট তৈরি হয়। তুমি জান কি না জানি না, সারা পৃথিবীতে মাত্র দুটো সংস্থা এই ট্যাবলেটটা তৈরি করে। আমরা আর নিউজ়িল্যান্ডের একটা কোম্পানি। তবে তাদের উৎপাদন আমাদের তুলনায় অনেকটাই কম।"

হেনরির সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ গল্প করে নিজের ঘরে ফিরে আসে নয়ন। তারপর সেদিন রাতে ভোলুকে সুইচড অফ করার পর নীলকে জড়িয়ে ধরে বলে, "মহীদাদুর স্বপ্ন আমি শেষ পর্যন্ত সফল করতে পারলাম নীল। পৃথিবীর অন্তত দশ লক্ষ শিশু স্বাভাবিক মানুষের জীবন ফিরে পাবে। ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। না হলে তো এই কাজটা করতেই পারতাম না।"

"দশ লক্ষটা কিন্তু পৃথিবীর জনসংখ্যার তুলনায় নেহাতই কম নয়ন। মহীদাদু চেয়েছিলেন পিউ-এর এই ষড়যন্ত্রের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে। যদি সত্যিই সেটা করতে হয়, তা হলে কিন্তু তোমার এইটুকুতেই সন্তুষ্ট হলে চলবে না," নীলের কথায় সায় দিয়ে মাথা নাড়ে নয়ন।

পরপর ছয় মাস, প্রতি তৃতীয় বুধবারে নানা অজুহাতে হেনরির ঘরে গিয়ে কন্টেনারে অ্যান্টিডোটের ক্যাপসুল মিশিয়ে আসে নয়ন। হেনরির সঙ্গে ইতিমধ্যে তার বেশ ভাবও হয়ে গিয়েছে। তাই সে কোনও সন্দেহ করেনি। কিন্তু তবু সাবধানতার জন্য মাঝখানে মাসতিনেক কাজটা বন্ধ রাখে নয়ন। ইচ্ছে করেই বুধবার বাদ দিয়ে অন্যদিনে হেনরির ঘরে যায়। বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলে। তথ্য সংগ্রহের ভান করে। তারপর আবার পরপর ছয় মাস লুকিয়ে কন্টেনারে অ্যান্টিডোটের ক্যাপসুল মিশিয়ে দেয়।

"মহীদাদুর ফরমুলা অ্যান্টিডোট তো মেশালাম। কিন্তু তাতে আদৌ কোনও কাজ হবে কি?"

নয়নের প্রশ্নটা শুনে নীল একটু আশ্চর্য হয়ে বলে, "তোমার এরকম সন্দেহ হচ্ছে কেন?"

"তার কারণ, মহীদাদু ফরমুলাটা তৈরি করেছিলেন। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষাও করেছিলেন। কিন্তু মানুষের শরীরে প্রয়োগ করে তো দেখতে পারেননি। তাই সেখানে যদি কোনও সমস্যা হয়ে যায়?"

"সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু করার নেই। যদিও তোমার কাছে যা শুনেছি, তাতে আমার মনে হয় না ওঁর মতো বড় মাপের একজন বিজ্ঞানী বিষয়টা সম্বন্ধে একদম নিশ্চিত না হয়ে তোমাকে এরকম একটা কাজের দায়িত্ব দেবেন।"

"মুশকিলটা কী বলো তো নীল, অ্যান্টিডোটটা কাজ করছে কি না, সেটা বোঝার আমার কোনও উপায় নেই। কারণ যেসব বাচ্চার শরীরে এটা যাচ্ছে, তাদের ডি এন এ যদি আগের অবস্থায় ফিরেও আসে, তা হলেও তো আমি সেটা জানতে পারব না।"

"আমার মনে হয় তুমি জানতে পারবে। তবে সেই জানাটা তোমার পক্ষে কতটা বিপজ্জনক হবে সেটা বলতে পারছি না। তাই সেই ভাবনাটা আপাতত তুলে রেখে যত বেশি সম্ভব বাচ্চার শরীরে অ্যান্টিডোট পাঠানো যায় সেই কাজটা করাই ভাল। অবশ্যই যতটা সম্ভব সাবধানে। কোনওমতেই যেন কারও সন্দেহ না হয়।"

অস্ট্রিয়ার বাকাও ভ্যালি। দানিয়ুব নদীর ধারে আঙুরের খেত। সোনালি রোদে ভেসে যাচ্ছে চারদিক। একপাশে একটা পুরনো দুর্গ। আসলে অবশ্য দুর্গ নয়, অনেকটা দুর্গের ধাঁচে তৈরি একটা ভিলা। পাঁচিলের গা বেয়ে উঠেছে আঙুরলতা। থোকা-থোকা কালো আঙুর ফলে আছে তাতে। ভিলার ভিতরে একটা ঘরে, লম্বাটে টেবিলের চারপাশে বসে আছেন বেশ কয়েকজন মানুষ। অমন সুন্দর একটা পরিবেশে থাকা সত্ত্বেও তাঁদের কারও মুখে কিন্তু হাসি নেই, বরং কপালে ভয়ংকর দুশ্চিন্তার ভ্রূকুটি। এখানে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা সকলেই পিউ-এর সর্বোচ্চ কমিটির মেম্বার। প্রেসিডেন্টের অত্যন্ত

জরুরি তলব পেয়ে সকলকে হাজির হতে হয়েছে। পিউ-এর এখন যিনি প্রেসিডেন্ট তাঁর নাম ক্রিস্টাল ক্রেটন। ডেনমার্কের বাসিন্দা। রোগা, লম্বা, খড়্গনাসা, রুপোলি চুল। অন্য সদস্যদের মধ্যে দু'জন বিজ্ঞানী আছেন। তাদের একজন হলেন মুসায়া মাব্বা, তিনি পেরুর লোক। অন্যজন কৃষ্ণ উডুগু, যাঁর বাড়ি শ্রীলঙ্কায় হলেও ইদানীং থাকেন কানাডায়।

ক্রেইন অভ্যেসমতো হাতের আঙুলের গাঁটগুলো বারকয়েক টেবিলে ঠুকে বললেন, “ডিয়ার মেম্বারস, আমি এতটাই চিন্তিত যে কথাটা কীভাবে শুরু করব সেটাই বুঝতে পারছি না। আমাদের পারফেক্ট ইউনিভার্স প্রজেক্ট আজ একটা সাংঘাতিক বিপদের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা এতদিন ধরে বহু চেষ্টায় মানুষের সব রকম অপ্রয়োজনীয় ইচ্ছে এবং চিন্তাভাবনাকে ছেঁটে ফেলার একটা ব্যবস্থা করেছিলাম। এর ফলে মানবসভ্যতা অনেক উন্নত হয়েছে। মানুষ এখন অনেক বেশি কাজ করতে পারে। কল্পনা কিংবা অবাস্তব চিন্তা-ভাবনা করে সময় নষ্ট করে না। আমরা যারা পৃথিবীটাকে চালাই, তারা সবদিক বিবেচনা করে যেসব সিদ্ধান্ত নিই, সেগুলোই তারা মেনে নেয়। প্রতিবাদ করার কিংবা নিজেদের খুশিমতো চলার ইচ্ছেও তাদের হয় না। এর ফলে আপনারা সবাই নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে সারা বিশ্বে এখন পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে। কোনও রকম হিংসা, হানাহানি, যুদ্ধ, বিদ্রোহ, বিপ্লব কিছুই এখন আর হয় না। কিন্তু এই শান্তি অনেকের সহ্য হচ্ছে না। তারা মানুষ, নাকি এই সৌরজগতের বাইরের কোনও প্রাণী আমি এখনও জানি না। কিন্তু তারা যে একটা গভীর ষড়যন্ত্র করছে সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি।

“ঘটনার সূত্রপাত ঠিক এক বছর আগে। পিউ-এর একদম নিচু স্তরের যারা সদস্য, তাদের মধ্যে কয়েকজন একটা ভারী আশ্চর্যজনক খবর আমাদের দেয়। আমরা মানে আমি এবং আমাদের দুই ভাইস প্রেসিডেন্ট কিম আর টিমোথিই প্রথমে কথাটা শুনি। খবরটা হল ইদানীং জাপানের কিছু জায়গায় বাচ্চাদের মধ্যে অদ্ভুত ধরনের প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। তারা তাদের যে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে সেটা সব সময় মানতে চাইছে না। শুধু তাই নয় তারা নাকি ছবি আঁকছে, গান গাইছে, বানিয়ে-বানিয়ে গল্প বলছে। বুঝতেই পারছেন কথাটা শুনে আমাদের প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। কারণ এই বাচ্চাদের সবারই ডি এন এ কারেকশন হয়েছে। তারপর এই ধরনের প্রবণতা থাকার কোনও আশঙ্কাই নেই। তাই আমরা বিষয়টাকে প্রথমে তেমন গুরুত্বও দিইনি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ফ্রান্স, জার্মানির মতো অনেক দেশ থেকেই এরকম খবর আসতে শুরু করে এবং আমরা যথাযথভাবে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি প্রতিটি খবরই সত্যি।

“বিপদের গুরুত্ব আঁচ করে মাসছয়েক আগে আমি, কিম আর টিমোথি একটা মিটিং করি। আমাদের মনে হয়েছিল এর পিছনে একটাই কারণ থাকতে পারে। কোনও কারণে এইসব বাচ্চাদের ডি এন এ কারেকশন ঠিকঠাক হয়নি। যাঁরা কাজটা করেছেন তাঁদের কাজে গাফিলতি ছিল। সেক্ষেত্রে তাদের জন্য যে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা হবে সেটাও আমরা ভেবে নিয়েছিলাম । কিন্তু তার আগে ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া দরকার ছিল। আজ আমাদের মধ্যে ডঃ মাব্বা আছেন। উনি জানেন যে এই পর্যায়ে আমরা ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল গন্ডগোলটা বুঝতে বাচ্চাগুলোর ডি এন এ পরীক্ষা করে দেখা। পিউ-এর কয়েকজন চিকিৎসক সদস্যের সাহায্যে আমরা যেসব শিশুকে অস্বাভাবিক বলে চিহ্নিত করা গিয়েছে, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের ডি এন এ সংগ্রহ করি। মাব্বা নিজে তাঁর ল্যাবরেটরিতে সেগুলো টেস্ট করেন। তার যা ফল এসেছে সেটা দেখেই আমরা আতঙ্কিত হয়ে আপনাদের সকলকে আজকের মিটিংয়ের জন্য ডেকেছি।”

প্রেসিডেন্টের কথা শুনে পিউ-এর সদস্যদের মুখে স্বাভাবিকভাবেই বিস্ময় এবং আশঙ্কার ছাপ ফুটে উঠল। ওদেরই মধ্যে একজন অ্যানা গিনেসবার্গ আর নিজেকে সামলাতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, “ডি এন এ পরীক্ষায় আপনারা কী পেলেন ক্রিস্টাল?”

“পরীক্ষায় জানা গিয়েছে ওদের কারওই কোনও রকম ডি এন এ কারেকশন হয়নি। একজন স্বাভাবিক মানুষের ডি এন এ যেমন থাকে, ওদেরও ঠিক তেমনই আছে। বুঝতেই পারছ সেজন্যই ওরা একজন পারফেক্ট ইউনিভার্সের শিশুর যেমন ব্যবহার করা উচিত তেমন ব্যবহার করছে না।”

“কী সর্বনাশ, তার মানে ওদের ডি এন এ কারেকশন হয়নি?”

“আমাদের কম্পিউটার ডেটা বলছে অবশ্যই হয়েছে। অপারেশনের পর কারেকটেড ডি এন এ-এর ছবিও আমাদের কাছে রয়েছে।”

“তা হলে কী করে এটা সম্ভব হল?”

“সেটাই তো আমরা বুঝতে পারছি না। কারেকশন হয়ে যাওয়া ডি এন এ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরল কী করে? বাচ্চাদের মা-বাবাকে অন্যভাবে জিজ্ঞেসবাদ করা হয়েছে। তাঁরা কিছুই জানেন না। যেসব ডাক্তারদের কাছে তাঁরা বাচ্চাকে নিয়ে যান, তাঁরাও কিছু বলতে পারেননি...” হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়েন ক্রিস্টাল। তাঁকে চুপ করতে দেখে কিম বলেন, “আপনারা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই যে পরিস্থিতি কতটা উদ্বেগজনক। কারণ শিশুদের কিছু করার ক্ষমতা আমাদেরও নেই। পৃথিবীতে এখন শিশুমৃত্যুর হার শূন্য। অথচ এই বাচ্চাগুলো যদি বড় হয়, তা হলে পারফেক্ট ইউনিভার্সের ব্যালান্সটাই পুরো নষ্ট হয়ে যাবে।”

টিমোথি এতক্ষণ চুপ করে দুজনের কথা শুনছিলেন। এবার তিনি তাঁর স্বাভাবিক শান্ত কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণে কেটে-কেটে বলেন, “সবচেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের হাতে এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনও তথ্য নেই। আমরা জানি না যতজন বাচ্চাকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি, তার বাইরে আরও কত এরকম বাচ্চা আছে। এও জানি না সেই সংখ্যাটা প্রতিদিন বাড়ছে কি না। ঘটনাটা কীভাবে ঘটছে বুঝতে পারা যাচ্ছে না বলেই, এটাকে কী করে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে সেটাও আমরা বুঝতে পারছি না। আসলে ক্রিস্টাল আপনাদের সকলকে আজ এজন্যই ডেকেছেন, যাতে আমরা সবাই মিলে আলোচনা করে কীভাবে এগোব তার একটা রাস্তা ঠিক করতে পারি।”

পিউ-এর অন্য মেম্বাররা সকলেই এতক্ষণ খুব মন দিয়ে এঁদের কথা শুনছিলেন। সকলেরই মুখে চোখে গভীর চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। নিজের কফির কাপে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে ক্রিস্টাল বললেন, “ডঃ মাব্বা, একজন বিজ্ঞানী হিসেবে আপনার কী মনে হয়, কীভাবে এটা হতে পারে? আপনি তো নিজে ডি এন এ টেস্ট করেছিলেন। ডঃ উডুগু আপনারই বা কী মত?”

ডঃ মাব্বা চিন্তিত মুখে তাঁর হাতে ধরা পামটপে খুটখাট করছিলেন। এবার সেটা সরিয়ে রেখে বললেন, “দেখুন, গত কয়েকদিন ধরেই আমি এই বিষয়টা নিয়ে ক্রমাগত পড়াশোনা এবং খোঁজখবর করে যাচ্ছি। ডি এন এ কারেকশন একবার হয়ে যাওয়ার পর আবার সেটাকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনার কোনও পদ্ধতি এখনও পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। কোনও দেশেই কেউ এবিষয়ে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা গবেষণাও করছে না। করলে সেটা আমরা ঠিকই জানতে পারতাম। আর তেমন করার কোনও কারণও নেই। ডি এন এ কারেকশনে ঠিক কী হচ্ছে সেটা আমরা পিউ-এর এই কয়েকজন মেম্বার ছাড়া আর কেউই জানি না। কিন্তু তা হলে কি আমরা ধরে নেব ঘটনাটা প্রাকৃতিক, আপনা থেকেই ঘটেছে?”

কিম-এর কথার উত্তরে মাথা নাড়লেন ডঃ উডুগু, “না, প্রাকৃতিকভাবে এটা হওয়া সম্ভব নয়। অন্তত এত তাড়াতাড়ি তো নয়ই। কোনও কারণ নিশ্চয়ই আছে। সেটাকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।”

“এতক্ষণ ধরে আলোচনাটা কিন্তু একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে,” বেশ একটু বিরক্ত গলায় কথাটা বললেন জার্মানির জন গ্রান্ডি, “কেন

হল সেটা যদি এখন বোঝা নাও যায়, কীভাবে হচ্ছে সেটা বোঝার তো চেষ্টা করতে হবে, যাতে আমরা অন্তত ব্যাপারটাকে কন্ট্রোল করতে পারি।”

মার্ক চাগাল টার্কির একজন খুব নামকরা চিকিৎসক। তিনি একটু অতিরিক্ত চুপচাপ মানুষ। সহজে কথা বলেন না। কিন্তু আজ পরিস্থিতি খুবই জটিল। মার্ক তাই সামান্য গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, “আমরা বুঝতে পারছি যে ঘটনাটা প্রাকৃতিক নয়। লজিক্যালি দেখলে, সেক্ষেত্রে বাচ্চাদের শরীরে এমন একটা কিছু ঢুকেছে যা ডি এন এ-এর চেহারাটা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছে, মানে সোজা কথায় বলতে গেলে একটা কোনও অ্যান্টিডোট ওদের শরীরে গিয়েছে। এখন সেটা কেউ সচেতনভাবে করেছে নাকি কোনওভাবে চলে এসেছে সেটা আমরা পরে খোঁজ নিয়ে দেখব। কিন্তু আমার মনে হয় আগে বোঝা দরকার কীভাবে এটা শরীরে ঢুকছে। সাধারণত এই দুটো পদ্ধতিতে শরীরে অ্যান্টিডোট ঢোকার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে। প্রথমতো খাবার আর দ্বিতীয়ত ওষুধ।”

“এগজ্যাক্টলি সো...” মার্কের কথায় সায় দিয়ে বলে উঠলেন আর এক সদস্য সিহান নঈম।

সিহানের দিকে তাকিয়ে সামান্য মাথা নেড়ে মার্ক বললেন, “ঘটনাটা শুধু বাচ্চাদের ক্ষেত্রেই ঘটেছে। এখনও পর্যন্ত বড়দের ক্ষেত্রে এরকম কোনও কিছু আমাদের রেডারে ধরা পড়েনি। তার মানে খাবার এবং ওষুধ যা শুধু বাচ্চাদের জন্য ব্যবহার করা হয় সেগুলো প্রথমে পরীক্ষা করা দরকার। ক্রিস্টাল, কোনও বিশেষ অঞ্চলের শিশুদের মধ্যেই এরকম হচ্ছে বলে কি আপনাদের মনে হয়েছে?”

মাথা নেড়ে ক্রিস্টাল বললেন, “উঁহু, একমাত্র নিউজ়িল্যান্ড আর তার আশপাশের কয়েকটা দেশ থেকে এখনও কোনও খবর আসেনি। যদিও আমার ধারণা ওখানে পিউ-এর গ্রাউন্ড লেভেলের যেসব কর্মী আছেন তাঁরা বিপদ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন নয় বলেই এটা হয়েছে। এছাড়া পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আমরা এই ধরনের এক বা একাধিক বাচ্চাকে আইডেন্টিফাই করেছি।”

“তবু এটা নোট রাখা দরকার। নিউজ়িল্যান্ড বা তার আশপাশের দেশের বাচ্চার কী ধরনের খাবার খায় আর ওষুধ ব্যবহার করে সেটা আমাদের একটা সার্ভে করে দেখতে হবে।”

“তা হলে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হবে বাচ্চাদের রোজকার খাবার আর ওষুধ পরীক্ষা করে দেখা, তাতে কোনও ধরনের কোনও অ্যান্টিডোট বা অপরিচিত এলিমেন্ট দেখতে পাওয়া যায় কি না। আমার মনে হয় ডঃ মাব্বা আর মার্কের লিডারশিপে আমরা এই কাজটা করি। আমি সারা বিশ্বের সব পিউ-এর এজেন্টকে বলে দিচ্ছি তার এলাকায় বাচ্চাদের যে খাবার আর ওষুধ ব্যবহার হয়, সেটা অ্যানালিসিস করে ডঃ মাব্বা আর মার্কের কাছে রিপোর্ট পাঠাতে। এর জন্য আমরা একটা ছয় মাসের টার্গেট ঠিক করছি। ঠিক ছ’মাস বাদে আমরা ওই রিপোর্টগুলো নিয়ে এখানেই আবার মিটিংয়ে বসব। যদি কিছু পাওয়া যায়, তা হলে তার উপর ভিত্তি করে পরের পদক্ষেপ ঠিক হবে। আর না পাওয়া গেলে আবার অন্যভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে।”

“আজ একটা বেশ অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে।”

রাতের খাবার খেয়ে, ভোলুকে সুইচড অফ করে বসেছে দুই বন্ধু। নীল কয়েকদিন আগেই বলেছে যে সে বাঁশিতে একটা খুব সুন্দর গানের সুর তুলেছে, সেটা নয়নকে শোনাবে। কিন্তু নয়নের একটা নতুন প্রজেক্টের কাজ চলছে বলে অনেক রাত পর্যন্ত লেখাপড়া আর কম্পিউটার নিয়ে খুটখাট করতে হচ্ছে। সময় আর পাচ্ছে না। নীল তাই একটু মনমরাই ছিল। কিন্তু নয়নের মুখে কথাটা শুনে একটু নড়েচড়ে বসে জিজ্ঞেস করল, “এত ব্যস্ততার মধ্যে আবার অদ্ভুত কী ঘটল?”

“আরে, আজ দুপুরে কাজ করতে করতে ক্লান্ত লাগছিল। আমার ল্যাবের কফিমেশিনটা গোলমাল করছে। তাই কাফে কর্নারে গিয়েছিলাম এক কাপ কফি খেতে। দেখি সেখানে এক মাগ হট চকোলেট নিয়ে হেনরি বসে আছে ভারী উদাস মুখে। ওরা তো আর তোমার মতো কবিতাটবিতা লেখে না, তাই হেনরির অমন পাঁশুটে মার্কা মুখ দেখে আমি তো অবাক। ছেলেটা এমনিতে বেশ হাসিখুশি। আর তুমি তো জান, গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে ইচ্ছে করেই আমি ওর সঙ্গে বেশ খানিকটা ঘনিষ্ঠতা করেছি। না হলে তো আমার মাঝে-মাঝে ওর ল্যাবে যাওয়াটা সন্দেহজনক হয়ে যেত। তবে হেনরি কিন্তু আমাকে বেশ পছন্দই করে। তাই আজ ওকে ওরকমভাবে বসে থাকতে দেখে আমি নিজেই গিয়ে ওর সামনে বসলাম। প্রথমে দু’-চারটে এমনি মামুলি কথাবার্তা হল। তারপর ও যা বলল, শুনে তো আমি অবাক।

“রহিম শাহ, মানে ওর বস নাকি আজ পুরো টিমকে ডেকে পাঠিয়েছিল। ওদের ওষুধ নিয়ে কমপ্লেন এসেছে। ওষুধ ঠিকমতো কাজ করছে না। তাই আপাতত কিছুদিনের জন্য ওষুধ বাইরে পাঠানো বন্ধ থাকবে। প্রোডাকশনও স্লো করে দেওয়া হবে। স্টোরে যে ওষুধ রয়েছে সেগুলো আর-একবার পরীক্ষা করে রিপোর্ট ঠিক থাকলে তবে এক্সপোর্ট হবে। রহিম শাহ নাকি বেশ কড়াভাবে হেনরিকে কথাগুলো বলেছে। স্বাভাবিকভাবেই হেনরি বেশ আপসেট।”

“অদ্ভুত ব্যাপার তো। হেনরি কী বলল, ও নিজে এরকম একটা অভিযোগের কী উত্তর দিয়েছে?”

“এরা তো খুব জোর দিয়ে কিছু বলতে পারে না। তবে হেনরি এটা বলেছে যে ওষুধে সমস্যা হওয়াটা খুব অস্বাভাবিক। কারণ সবকিছু ফরমুলা মেনে করা হয়। প্রত্যেক স্টেজে আলাদা টেস্টিংয়ের ব্যবস্থা আছে। ও রহিম শাহের কাছে জানতে চেয়েছে যে কী ধরনের কমপ্লেন এসেছে। কিন্তু রহিম শাহ নাকি তার কোনও উত্তর দেয়নি। শুধু বলেছে উপরমহল থেকে ওকে এটা জানানো হয়েছে, তাই সবাইকে ভীষণ রকম অ্যালার্ট হতে হবে, না হলে বিপদ হতে পারে।”

নীল একটু চুপ করে কী যেন ভাবে, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, “নয়ন তুমি প্রথমবার যে ওষুধে অ্যান্টিডোট মিশিয়েছিলে সেটা ঠিক কত বছর হল?”

নীলের কথায় চমকে ওঠে নয়ন। মনে-মনে একটু হিসেব করে বলে, “ঠিক ছ’বছর।”

“মহীদাদুর ওষুধ কাজ করছে নয়ন। তুমি সাবধান হও।”

“কী করে বুঝলে তুমি?” উত্তেজনায় নয়নের গলা প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে।

“বুঝেছি বলব না। অনুমান বলতে পার। তবে অনুমানটা মনে হয় ভুল নয়। বাচ্চাদের স্বভাবে বদল হচ্ছে। সেই বদলের কথাটা পিউ জানতে পেরেছে। জানার পর তার কারণ খুঁজতে শুরু করে হেনরির ল্যাবরেটরি পর্যন্ত কিন্তু পৌঁছে গিয়েছে ওরা। তার মানে গোলমালের কারণটা যে ওষুধ, সেটা এখন ওরা জানে...”

“কিন্তু হেনরির ল্যাবে গোলমালটা হচ্ছে বুঝলেও ওরা আমাকে চিহ্নিত করবে কী করে?”

“একটা কথা ভুলে যেয়ো না নয়ন, মহীদাদু কিন্তু বলেছিলেন পিউ-এর হাত যে কত লম্বা তোমাদের কোনও ধারণা নেই।”

নীলের অনুমান অনেকটাই ঠিক। বাস্তবিকই পিউ-এর হাত অনেকটাই লম্বা। বাকাও ভ্যালিতে সেই বৈঠকের পর পিউ-এর সব স্তরের কর্মীদের কাছেই অ্যালার্ট মেসেজ যায়। সেই মেসেজ অনুযায়ী প্রত্যেকেই তাদের নিজেদের এলাকায় বাচ্চাদের জন্য যেসব খাবার আর ওষুধ বাজারে বিক্রি হয় তার স্যাম্পল টেস্টিং শুরু করে। রিপোর্টগুলো আসতে থাকে ডঃ মাব্বা আর মার্কের কাছে। বেশ কিছু রিপোর্ট আসার পর সন্দেহটা প্রথমে হয় ডঃ মাব্বারই। তিনি লক্ষ করেন, জন্মের পর প্রথম পাঁচ মাস বাচ্চারা যেসব ওষুধ খাচ্ছে, তার মধ্যে নেভিটা নামের একটি ওষুধে একটা অজানা এলিমেন্ট রয়েছে।

ডঃ মাব্বা সঙ্গে সঙ্গে মার্ককে ব্যাপারটা জানান। তিনিও রিপোর্টগুলো পরীক্ষা করে ডঃ মাব্বার সঙ্গে একমত হন। কিন্তু ল্যাবরেটরিতে অনেক রকম পরীক্ষা করেও এলিমেন্টটা যে কী সেটা বোঝা যায় না। তবে দু'জনে মিলে পৃথিবীর কোন-কোন জায়গায় এই ধরনের ওষুধ বিক্রি হচ্ছে তার একটা তালিকা তৈরি করেন। তাতে দেখা যায় নিউজ়িল্যান্ড এবং তার আশপাশের কয়েকটা দেশ বাদ দিলে প্রায় সব দেশের রিপোর্টেই এই অজানা এলিমেন্টের অস্তিত্ব রয়েছে। ছয় মাস পরে পিউ-এর মিটিংয়ে তাঁরা যা জেনেছেন এবং বুঝেছেন সেটা পুরোটাই ব্যাখ্যা করেন ডঃ মাব্বা।

"আপনারা কি মনে করছেন যে এই এলিমেন্টটাই ডি এন এ-কে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনছে?"

"সেটা নিশ্চিতভাবে বোঝার কোনও উপায় নেই ক্রিস্টাল। কারণ ল্যাবে এই এলিমেন্টটা বিশ্লেষণ করে আমরা এটুকু বুঝতে পেরেছি ডি এন এ তৈরি করতে যেসব উপাদান লাগে, সেগুলো এটার মধ্যে আছে। এছাড়া বাকি যেসব উপাদান রয়েছে সেগুলোও অধিকাংশই আমাদের চেনা। তাই মার্কের এক পেশেন্টের ডি এন এ নিয়ে সেই বেসিক কমপোনেন্টের সঙ্গে অন্য উপাদানগুলো মিশিয়ে আমরা এলিমেন্টটা তৈরি করেছিলাম। তারপর ল্যাবে একটা কারেকশন করা ডি এন এ-এর উপর সেটাকে অ্যাপ্লাইও করি। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি। কারেকশন করা ডি এন এ আগের অবস্থাতেই ছিল। কোনও বদল হয়নি। তার মানে আমি বলতে চাইছি এই অজানা এলিমেন্টটা যে আসলে অ্যান্টিডোট, তার কোনও প্রমাণ কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমরা পাইনি।"

"তা হলেও কিন্তু সন্দেহটা একেবারেই যাচ্ছে না ডঃ মাব্বা। বরং বিষয়টা আরও জটিল হচ্ছে," টিমোথির গম্ভীর গলায় রীতিমতো উদ্বেগের ছাপ, "প্রথমত এই অজানা এলিমেন্টটা ওষুধে এল কী করে? ওষুধ তৈরির সময় প্রত্যেক স্টেপে পরীক্ষা করা হয়। আপনারা আমাকে সন্দেহের কথাটা জানানোর পর আমি সেইসব রিপোর্ট আনিয়ে পরীক্ষা করেছি। কিন্তু তাতে এরকম কোনও এলিমেন্টের উল্লেখ নেই। তা হলে ওটা ওষুধের মধ্যে গেল কী করে?"

"তার থেকেও আমার মতে এখন যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল সারকামস্ট্যানসিয়াল এভিডেন্স মানে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনো।"

"আপনি কি বলতে চাইছেন ডঃ উডুগু?" জানতে চায় ক্রিস্টাল।

"ভেরি সিম্পল। আমাদের সার্ভে থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, যে সব অঞ্চলের বাচ্চারা এই ওষুধটা খাচ্ছে তাদের মধ্যেই পরিবর্তনটা হচ্ছে। অন্য কোনও খাবার বা ওষুধে অজানা কিছু পাওয়া যায়নি। যে-যে অঞ্চলের ওষুধে এই এলিমেন্ট নেই, সেখানে বাচ্চাদের কোনও বদলও হয়নি। তার মানে আমরা কিছু খুঁজে পাই বা না পাই বদলটা হওয়ার পিছনে ওই এলিমেন্টের কোনও একটা ভূমিকা আছে। তাই আগে আমাদের বাচ্চারা যাতে আর এই ওষুধটা না খায় সেটার ব্যবস্থা করা দরকার।"

"সেটা আমরা শুরু করেছি ডঃ উডুগু। ডঃ মাব্বা তাঁর সন্দেহের কথাটা আমাদের জানানোর সঙ্গে-সঙ্গেই যে ল্যাবরেটরিতে এই ওষুধগুলো তৈরি হয়েছিল, সেখানে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে স্টোর থেকে কোনও ওষুধ যেন এক্সপোর্ট করা না হয়। প্রোডাকশন বন্ধ করা হয়নি ঠিকই কিন্তু অনেকটাই কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া যারা ওই ওষুধ তৈরির সঙ্গে যুক্ত তারা সকলেই এখন কড়া নজরদারির অধীনে। তাদের প্রত্যেকের মনোবাহী মনিটর করা হচ্ছে। প্রত্যেকের বাড়িতে যে রোবট কাজ করে, তার হার্ড ডিস্কে একটা স্পেশ্যাল চিপ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের মেম্বাররা নিজে ওদের সকলের বাড়িতে গিয়ে সার্ভিসিং কিংবা ব্যাটারি বদলানোর নাম করে এই কাজটা করে এসেছেন। তার ফলে এই লোকগুলো যখন বাড়িতেও থাকছে তখন কী করছে, কার সঙ্গে কথা বলছে সব কিছু আমরা নজর রাখতে পারছি।"

"মনিটর করে কী আমরা এখনও পর্যন্ত কোনও ক্লু পেয়েছি?" টিমোথিকে জিজ্ঞেস করলেন ইজ়রায়েলের ম্যাক্স অ্যালেন।

"দুর্ভাগ্যের বিষয় এখনও পর্যন্ত কিছু পাওয়া যায়নি। আমাদের সন্দেহের তালিকায় একদম প্রথমে যে লোকটি রয়েছে তার নাম হেনরি বার্ট। কারণ তার তত্ত্বাবধানেই ওষুধটা তৈরি হয়। একদম ফাইনাল স্টেজের সুপারভাইজ়ারও সে নিজেই। হেনরিকে আমরা সবচেয়ে বেশি সন্দেহ করছি এই কারণেই যে আমরা জানতে পেরেছি ফাইনাল মিক্সিংয়ের পর আর কোনও টেস্টিংয়ের ব্যবস্থা নেই। এখান থেকে মিশ্রণটা সরাসরি ট্যাবলেট মেকিংয়ের স্টেজে চলে যায়। তার মানে কোটিং দিয়ে ফয়েলে ভরে ফেলা হয়। সুতরাং বুঝতেই পারছেন এই স্টেজে যদি কিছু মেশানো হয়, তা হলে সেটা মনিটর না হয়েই ট্যাবলেটে চলে যাবে। আর সেই কাজটা করার সুযোগ আছে একমাত্র হেনরি বার্টের। হেনরিকে কড়া নজরদারিতে রাখা হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোনও তথ্যই পাওয়া যায়নি।"

"আপনার কি মনে হয় হেনরি নিজে এই অ্যান্টিডোট তৈরি করেছে এবং সেটা সে ফাইনাল মিক্সিংয়ের সময় মিশিয়ে দিচ্ছে?"

ম্যাক্সের কথা শুনে খুব ধীরে-ধীরে মাথা নাড়লেন ক্রিস্টাল, "আমার মনে হয় না। একেবারেই মনে হয় না। হেনরি বার্টের পুরো বায়োডেটা আমি দেখেছি। ওর ডি এন এ কারেকশন করা আছে। একজন ডি এন এ কারেকশন করা মানুষের পক্ষে এরকম সাংঘাতিক অ্যান্টিডোট আবিষ্কার করাই সম্ভব নয়। হেনরি যে কাজটা করে তার জন্য অফিশিয়ালি আমরা ওকে বিজ্ঞানী বলি, কিন্তু আসলে ও একজন খুব সাধারণ মানের কর্মী। ট্যাবলেট তৈরি করার পদ্ধতিটা হেনরি খুব ভাল করে জানে আর সেটাই নিখুঁতভাবে করতে পারে। তাই এটাও আমাদের কাছে একটা বিরাট প্রশ্ন যে, হেনরি যদি কাজটা করেও থাকে এলিমেন্টটা ও পেল কোথা থেকে আর কীভাবেই বা পেল?"

"এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই," ডঃ উডুগুর কথা শুনে তার দিকে ঘুরে তাকান ক্রিস্টাল, "একজন বিজ্ঞানী হিসেবে আমি মনে করি, এই এলিমেন্টটা যদি সত্যিই অ্যান্টিডোট হয়, তা হলে এটা তৈরি করার জন্য, ডি এন এ নিয়ে যে ধরনের জ্ঞান এবং গবেষণা দরকার, সেটা করার ক্ষমতা এই মুহূর্তে পৃথিবীতে কারও নেই। অন্য গ্রহের কোনও প্রাণী এসে যদি করে থাকে, তা হলে অবশ্য সেটা আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়।"

"আমিও ডঃ উডুগুর সঙ্গে একমত," বললেন ডঃ মাব্বা, "তবে এক্ষেত্রে আমি একটা কথাই বলব। একজন হয়তো এই কাজটা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি অনেকদিন হল মারা গিয়েছেন।"

"আপনি কার কথা বলছেন ডঃ মাব্বা?" টিমোথি জানতে চায়।

"ডঃ মহীয়ান দত্ত। ডঃ দত্ত বেঁচে থাকলে কোনও সন্দেহ থাকত না তিনিই কাজটা করেছেন। ইনফ্যাক্ট অ্যান্টিডোটের প্রসঙ্গটা ওঠার পর আমার প্রথমে ওঁর কথাই মনে হয়েছিল। কিন্তু তারপর আমি হিসেব করে দেখলাম, যে বাচ্চাগুলোর মধ্যে এই পরিবর্তনটা এসেছে, তাদের কারওই বয়স ছ'বছরের বেশি নয়। তার মানে এই অ্যান্টিডোটটা কাজে লাগানো হচ্ছে বছরছয়েক আগে থেকে। কিন্তু ডঃ মহীয়ান দত্ত মারা গিয়েছেন প্রায় বছরদশেক। সুতরাং তিনি কোনওভাবেই এটা আবিষ্কার করতে পারেন না।"

"আপনি ঠিকই বলেছেন ডঃ মাব্বা," সায় দেয় কিম, "ডঃ দত্তের পক্ষেও এই কাজটা করা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। কারণ আপনারা সবাই জানেন, মারা যাওয়ার আগে প্রায় বছরসাতেক উনি জুরান্তিতে নির্বাসনে ছিলেন। আমাদের কথায় রাজি হননি বলে ওঁকে ওখানে পাঠানো হয়েছিল। জুরান্তিতে কোনও ঠিকঠাক ল্যাবরেটরি ছিল না। আমরা ওঁর রোবট পিলুর কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম, তা সত্ত্বেও উনি নিজস্ব কিছু জিনিসপত্র নিয়ে টুকটাক কাজ করতেন। কিন্তু সেগুলো একেবারে ছেলেখেলার ব্যাপার। ডঃ দত্তর মৃত্যুর কিছুদিন পরে ওঁর স্ত্রীও মারা যান। ওঁদের কোনও সন্তান নেই। দু'জনের মৃত্যুর পর জুরান্তির বাড়ি ভাল করে তল্লাশি করা হয়েছিল।

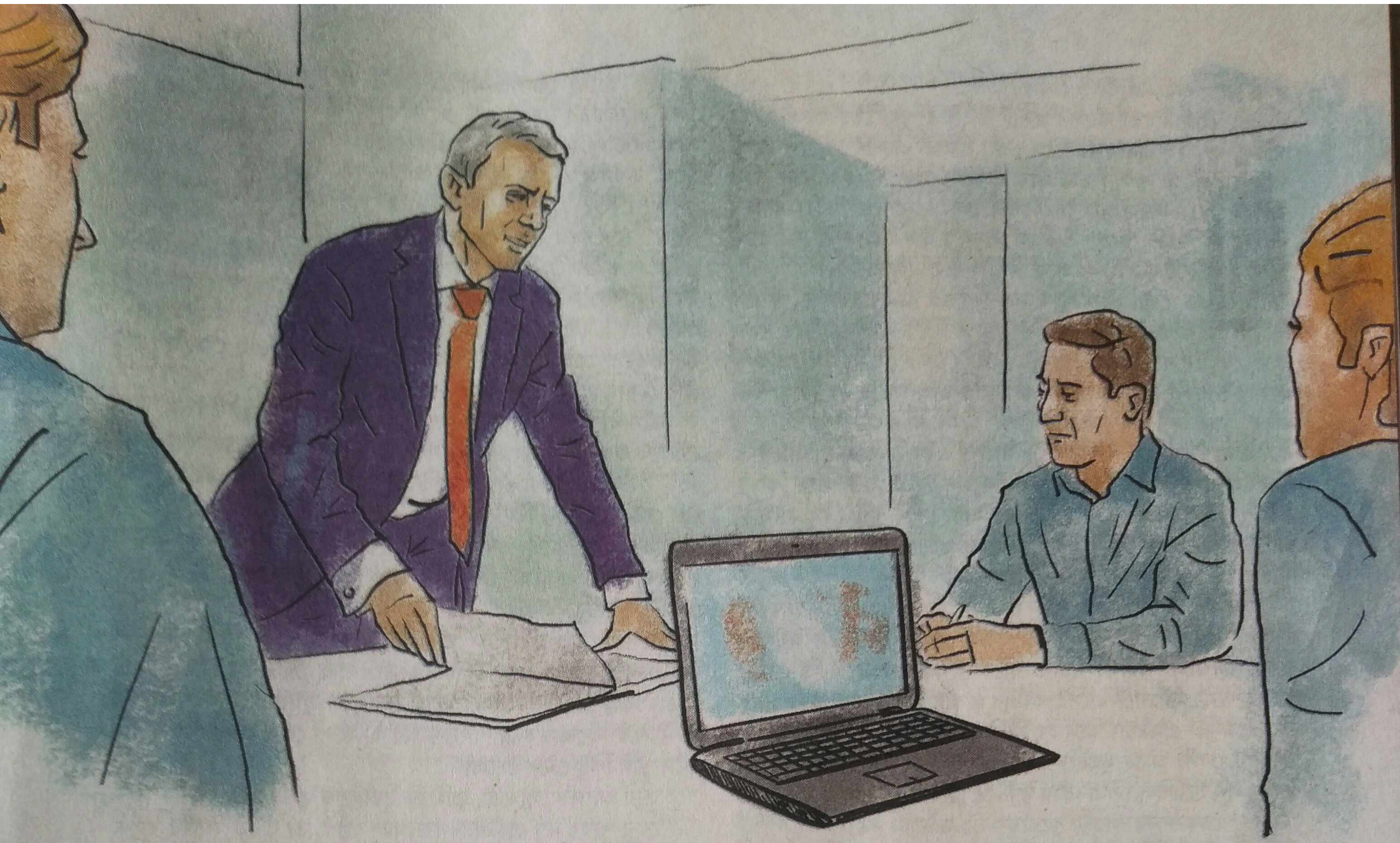

সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি। সুতরাং এই সম্ভাবনাটা মনে হয় বাদ দেওয়াই ভাল।”

মিটিংয়ে ঠিক হল হেনরি বার্টদের ল্যাবরেটরি থেকে ওষুধ এক্সপোর্ট আপাতত বন্ধ থাকবে। তবে সেটা কাউকে জানানো হবে না। ওষুধ এনে পিউ-এর তত্ত্বাবধানে স্টোর করা হবে এবং পরীক্ষা করার পর নিরাপদ বুঝলে তবেই বাইরে ছাড়া হবে। ল্যাবরেটরির কাজ স্বাভাবিকভাবেই চলতে দেওয়া হবে। যে এই দুষ্কর্মটি করছে সে যদি সব ঠিক হয়ে গিয়েছে ভেবে আবার সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে তা হলে এবার নিশ্চিত ধরা পড়বে। যদিও ক্রিস্টাল নিজে মনে করছেন সেরকম সম্ভাবনা খুবই কম। এছাড়া ডঃ মাব্বা, ডঃ উডুগু আর মার্ক মিলে অজানা এলিমেন্টটাকে আবার পরীক্ষা করে দেখবেন যদি কিছু পাওয়া যায়।

সব সিদ্ধান্তই সর্বসম্মতিক্রমে হয়েছে। অন্য রকম কোনও মতামতও ছিল না। কিন্তু তবু মিটিং সেরে সলসবুর্গে নিজের বাড়িতে ফিরে এসে কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল টিমোথির। বারবারই মনে হচ্ছিল কিছু একটা যেন বাদ পড়ে গেল। কোনও একটা বিষয়ে আরও একটু আলোচনা, আরও একটু আলো ফেলার দরকার ছিল, কিন্তু সেটা হল না।

শীতকাল। ন্যাড়া মেপল গাছের ডালগুলো বরফে ঢেকে গিয়েছে। সারাদিন গোটা আকাশের রংটা কেমন যেন ছাই-ছাই হয়ে ছিল। এখন সেটা নিকষ কালো। কাচের জানলা দিয়ে সেই অন্ধকার আকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিজের পড়ার টেবিলে এসে বসেন টিমোথি। রাগে তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে আছে। এমনভাবে তাঁদের এতদিনের পরিকল্পনা যে বানচাল করে দিল, তাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে তাঁর । কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁকে চেনার কোনও উপায়ই নেই।

দাঁতে দাঁত চেপে টিমোথি মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, এত সহজে হার তিনি মানবেন না। তারপর কম্পিউটার খুলে ডি এন এ-সংক্রান্ত সব রকম রিসার্চ পেপার খুলে পড়তে-পড়তে একসময় এসে হাজির হলেন ডঃ মহীয়ান দত্তের ফাইলে। ডি এন এ নিয়ে সত্যিই যুগান্তকারী কাজ করেছেন ডঃ দত্ত। টিমোথিরা যে আজ পারফেক্ট ইউনিভার্সের কথা ভাবতে পেরেছে, সেটা তো তাঁরই সৌজন্যে। তিনি অবশ্য নিশ্চিত এতসব ভেবে কাজটা করেননি। তবে তাতে তো কিছু আসে যায় না। বিজ্ঞানীর কাজ আবিষ্কার করা। তারপর সেটাকে কীভাবে কাজে লাগানো হবে, সে তো যারা দেশ চালায় তারা ঠিক করবে। আবিষ্কারের জন্য যথেষ্ট পুরস্কারও পেয়েছিলেন মহীয়ান দত্ত। যদিও পরের দিকে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পিউ-এর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিলেন। তার ফলও অবশ্য হাতেনাতে পেয়েছেন।

রিসার্চের পেপারগুলো দেখে নিয়ে টিমোথি কী ভেবে পিউ-এর সংগ্রহে রাখা মহীয়ান দত্তের নিজস্ব ফাইলটাও খোলেন। এতে ডঃ দত্তের ব্যক্তিগত জীবনের সব রকম তথ্য দেওয়া আছে। বিশেষ করে জুরান্তিতে থাকার সময় যেহেতু তিনি আন্ডার-সার্ভেলেন্স ছিলেন, তাই প্রতিদিনের খুঁটিনাটি সবই সেখানে রয়েছে। ডঃ দত্তের বাড়িতে ছিল পিলু নামের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী রোবট। সে প্রতিদিন মহীয়ান এবং তাঁর স্ত্রীর যাবতীয় গতিবিধি-কথাবার্তার একটা রিপোর্ট পাঠাত। টিমোথি খুব মন দিয়ে পিলুর পাঠানো সেই রিপোর্টগুলো পড়তে লাগলেন। বেশির ভাগই খুব মামুলি ইনফরমেশন। তার মধ্যে দুটো জিনিস টিমোথির দৃষ্টি আকর্ষণ করল। প্রথমতো জুরান্তিতেও ডঃ দত্ত একটা নিজস্ব ছোট্ট ল্যাবরেটরি তৈরি করেছিলেন। সেটাতে যন্ত্রপাতি অবশ্য খুব কম ছিল। অন্যান্য ব্যবস্থাও একেবারেই সাধারণ মানের। অন্তত পিলুর পাঠানো রিপোর্ট থেকে যা মনে হয়। কিন্তু সেখানে তিনি কী কাজ করতেন তার কোনও ফোটো পিলু পাঠায়নি। তার মানে তিনি ল্যাবে কাজ করার সময় পিলুকে সুইচড অফ করে দিতেন। ব্যাটারি চার্জের জন্য রাত বারোটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত পিলু সুইচ্‌ড অফ থাকত। সেটা ডঃ দত্তরও ঘুমনোর সময়। সুইচড অফ থাকার সময়ের এদিকওদিক হলে সেটার উল্লেখ থাকত রিপোর্টে। কিন্তু তা হয়নি। তার মানে ডঃ দত্ত ল্যাবরেটরিতে যাই-ই কাজ করুন না কেন, সেটা

রাত জেগে করতেন। কিন্তু কেন?

এই গোপনীয়তা কীসের জন্য? দ্বিতীয়ত জুরান্তিতে থাকাকালীন মাত্র দু'জন মহীয়ান দত্তর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। দু'জনেই তার পরিবারের সদস্য। তার মধ্যে একজন দেখা যাচ্ছে মহীয়ানবাবুর আগেই মারা গিয়েছেন। দ্বিতীয়জন হল নয়ন দত্ত। মহীয়ানবাবুর বংশের ছয় প্রজন্ম পরের একজন মানুষ । এই নয়ন দত্ত কে? কেন তিনি জুরান্তিতে ডঃ দত্তের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন?

পিউ-এর ডেটা বেস খুলে নয়ন দত্তের নাম দিয়ে সার্চ করতে গিয়েই চমকে ওঠেন টিমোথি। হেনরি বার্ট যে ল্যাবরেটরিতে কাজ করে, যেখানে বাচ্চাদের ওই ওষুধ নেভিটা তৈরি হয় নয়ন দত্তও কাজ করে ওই একই গবেষণাগারে। কপালের ভাঁজ গভীর হয় টিমোথির। যদিও নয়ন দত্তর বায়োডেটা দেখে তিনি খানিকটা হতাশই হন। নয়নও বার্টের মতোই খুব সাধারণ মাপের একজন বিজ্ঞানী। বাচ্চাদের জন্য যেসব ওষুধ তৈরি হয় তার কোনও সাইড এফেক্ট আছে কি না, সেটা বোঝাই তার কাজ। কাজকর্মের ধারা দেখে স্পষ্টই বোঝা যায়, অ্যান্টিডোট তৈরির ক্ষমতা তার নেই। তা ছাড়া তার যা বয়স, তাতে নিশ্চিত ডি এন এ কারেকশনও হয়েছে।

কিন্তু তবু মনের খুঁতখুঁতুনি যায় না টিমোথির। তিনি নয়নের জীবনের প্রতিটি ছোটখাট ঘটনা, যার রেকর্ড পিউ-এর দফতরে রয়েছে সেগুলো পরীক্ষা করতে থাকেন। করতে-করতে ডি এন এ কারেকশনের রিপোর্টে এসেই আবার একটা সাংঘাতিক চমক লাগে তাঁর। এমনকী প্রথমটায় মনে হয় তিনি বোধ হয় চোখে ভুল দেখছেন। রিপোর্টে লেখা আছে মুম্বইয়ের যে হাসপাতালে নয়নের ডি এন এ কারেকশন হয়েছিল সেখানকার দায়িত্বে ছিলেন ডঃ সুরানা। কিন্তু ডি এন এ কারেকশনের কাজটা করেছেন ডঃ মহীয়ান দত্ত।

ডঃ সুরানা পিউ-এর একজন নিচুতলার সদস্য। পরদিন সকালেই তাঁকে ফোন করেন টিমোথি। অনেকদিন আগের কথা। কিন্তু ঘটনাটা যেহেতু বেশ অভিনব, তাই ডঃ সুরানার সবটাই বেশ স্পষ্ট মনে আছে। ডঃ দত্ত সুরানাকে বলেছিলেন গবেষণার কাজের জন্য কয়েকটা ডি এন এ কারেকশন তাঁকে নিজে হাতে করতে হবে। নয়নের মা যেহেতু তাঁর আত্মীয়। তাই ওর সন্তানের ক্ষেত্রে কাজটা তিনি করতে চান। পিউ-এর একেবারে উপরতলার সদস্যের এমন অনুরোধে স্বাভাবিকভাবেই রাজি হয়েছিলেন ডঃ সুরানা। রিপোর্টেও সেটাই লিখেছিলেন। কোনওদিন এ নিয়ে তাঁকে কেউ কোনও প্রশ্নও করেনি।

এখানেই শেষ নয়। নয়নের বায়োডেটায় এটাও লেখা আছে যে, তার যখন বছরপাঁচেক বয়স, তখন তার মায়ের অরগ্যান রিপ্লেসমেন্ট হয়। মা শয্যাশায়ী ছিলেন বলে ডঃ মহীয়ান দত্ত বিশেষভাবে আবেদন করে নয়ন দত্তকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে প্রায় চার-পাঁচ মাস রেখেছিলেন। ডঃ দত্তের ফ্যামিলি ট্রি-তে আর কোনও আত্মীয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু তিনি এরকম করেছেন বলে দেখা যাচ্ছে না।

'এই নয়ন দত্ত লোকটা খুবই গোলমেলে। একে এক্ষুণি সার্ভেলেন্সের আন্ডারে নিয়ে আসা দরকার...' আপনমনে কথাগুলো বিড়বিড় করেন টিমোথি।

নয়নের বারান্দা-বাগানের টবে একটা লতানে গোলাপের গাছ লাগানো হয়েছিল কিছুদিন আগে। নয়ন আর নীল গিয়েই জঙ্গল থেকে নিয়ে এসেছিল চারাটা। তাতে একটা ছোট্ট কুঁড়ি ধরেছে। সেটা দেখেই সকালবেলায় মন ভাল হয়ে গিয়েছিল নীলের। কিন্তু লতাটা মাটিতে ঝুলে পড়েছে। সেটাকে তাই তুলে একটা পাতলা সুতো দিয়ে বারান্দার ফাইবার গ্লাসের পাল্লাটার গায়ে বাঁধার চেষ্টা করছে সে এমন সময় দরজার সোলার বেলটা বেজে উঠল। ভোলু রান্নাঘরে ভারী সুন্দর গন্ধ ছড়িয়ে কী যেন রাঁধছে। তার দিকে হাত নেড়ে নীল নিজেই গিয়ে দরজাটা খুলল। দু'জন অচেনা লোক। তারা এসেছে সার্ভিসিং কোম্পানি থেকে। ভোলুর সার্ভিসিং করানোর সময় হয়ে গিয়েছে।

নীল একটু আশ্চর্য হয়। ছয় বছরেরও বেশি সে নয়নের সঙ্গে এই বাড়িতে আছে। ভোলুর সার্ভিসিং এর আগেও কয়েকবার হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই নয়নই চার্ট দেখে সার্ভিসিং কোম্পানিকে খবর দেয় অথবা ভোলুকে গাড়িতে করে নিয়ে যায়। সার্ভিসিং কোম্পানি নিজে-নিজে কখনও এরকম বাড়িতে আসে না। সন্দেহ হয় নীলের। কিন্তু সে মুখে কিছু বলে না। ভোলু রান্না শেষ করে আসার পর তাকে সুইচড অফ করে কাজ শুরু করে লোকগুলো। নীল একটু দূরে বসে আড়চোখে সেদিকে লক্ষ রাখে। ভোলুকে খুলে টুকটাক কীসব পরিষ্কার করে লোকগুলো। তারপর বন্ধ করার আগে তার ঘাড়ের কাছে একটা খোপে ছোট্ট একটা চিপ ঢুকিয়ে দেয়। কাজটা নজর এড়ায় না নীলের। লোকগুলো অবশ্য নীলকে মোটেই গুরুত্ব দেয় না। কারণ নীলের তো এটা দেখার কিংবা এটা নিয়ে ভাবার কথাই নয়।

নয়ন বাড়ি ফেরে সন্ধের পর। সাধারণ কিছু কথাবার্তার পর নীল নয়নকে জানায় যে আজ সার্ভিসিংয়ের লোক এসেছিল ভোলুর জন্য।

"সে আবার কী! ভোলুর সার্ভিসিং তো এখনও দেরি আছে। আমি তো কোনও খবরও দিইনি।"

"তাতে কী আছে। ওরা তো ওদের রেকর্ড মেনেই এসেছে। হয়তো কোনও কারণ এবারে সার্ভিসিংটা আগে করা দরকার। তুমি নিশ্চয়ই খেয়াল করোনি।"

নীলের চোখের দিকে তাকিয়ে নয়ন বুঝতে পারে যে সে আলোচনাটা আর বাড়াতে চাইছে না। তাই থেমে যায় তখনকার মতো। কিন্তু রাতে রোজকার মতো ভোলুকে সুইচড অফ করার পর সে নীলকে জিজ্ঞেস করে, "ব্যাপারটা কী বলো তো? আমার মনে হল তখন তুমি কিছু চেপে গেলে?"

"তার আগে বলো তো, তুমি কি ভোলুকে খুলতে পার?"

"কেন পারব না। ছোটখাট গন্ডগোল হলে তো আমি নিজেই ওকে সারাই। ওকে যখন কিনেছিলাম তখনই ওগুলো আমাকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। খোলার জন্য কয়েকটা আলাদা যন্ত্রপাতিও আছে।"

"তা হলে এক্ষুনি ওকে খোলো।"

নয়ন নিজের ঘর থেকে থেকে যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে এসে খাবার টেবিলের উপর ভোলুকে শুইয়ে তার পিঠের স্ক্রুগুলো খুলে ফেলতেই ভিতরের যন্ত্রপাতি সব বেরিয়ে পড়ে । নীল এবার ঘাড়ের নীচের সেই খোপ থেকে টেনে বার করে চিপটা।

"এটা ভাল করে দ্যাখো। আমার ধারণা এটা একটা মনিটরিং সিস্টেম। এই চিপটা আজ সার্ভিসিংয়ের লোকেরা লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছে। এটা কিন্তু ভোলুর ভিতরে আগে ছিল না।"

"কম্পিউটারে লাগিয়ে দেখলেই তো বোঝা যাবে।"

"না, কম্পিউটারে লাগিয়ে দেখা চলবে না। কারণ তা হলে এটা অন হয়ে যাবে। যারা এটা লাগিয়েছে তারা বুঝে ফেলবে।"

নীলের কথা শুনে একটু চিন্তা করে নয়ন। তারপর বলে, "দাঁড়াও এটার একটা ফোটো তুলে সার্চ দিয়ে দেখি। তা হলেই বুঝতে পারব।"

চিপের ফোটোটা কম্পিউটারে দিয়ে সার্চ করতেই বোঝা যায় যে নীলের সন্দেহই ঠিক। চিপটা আসলে একটা খুব উন্নতমানের মনিটরিং সিস্টেম। তাতে চারপাশের সব ঘটনার ফোটো এবং কথাবার্তা রেকর্ড হয়।

"সার্ভিসিংয়ের লোকগুলো এটা বসাল কেন বলো তো?"

"ওরা সার্ভিসিংয়ের লোক নয় নয়ন। ওরা পিউ-এর লোক। তার মানে পিউ ঘটনার সূত্র সন্ধান করতে-করতে তোমার কাছ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। কতটা তোমার সম্বন্ধে জেনেছে সেটা বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু ওরা যে তোমার কাজকর্মের উপর নজর রাখছে, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। অফিসেও নিশ্চয়ই এরকম কোনও একটা ব্যবস্থা হয়েছে। সেটা তুমি টের পাওনি। বাড়ির ব্যাপারটাও তুমি টের পেতে না। কারণ ওরা যেসময় এসেছিল তখন তো তোমার বাড়িতে থাকার কথা নয়। সুতরাং ওরা যদি চিপটা বসিয়ে চলে যেত, তুমি জানতেও পারতে না। আমি থাকাতেও অবশ্য ওদের কোনও অসুবিধে হয়নি। কারণ ওরা তো ধরেই নিয়েছে যে, আমি একজন ডি এন এ

কারেকশন করা মানুষ। তাই আমি ব্যাপারটা লক্ষও করব না, আমার মনে কোনও প্রশ্নও জাগবে না।”

“বুঝতে পেরেছি। আমাদের এখন খুব সতর্ক থাকতে হবে নীল। তুমি কিন্তু কোনও কারণেই তোমার ঘরে ভোলুকে ঢুকতে দেবে না কিংবা ভোলুর সামনে কোনও কিছু করবে না। কারণ অন্য রকম কিছু দেখলেই ওদের সন্দেহ হবে।”

“সেটা আমি আজ থেকেই শুরু করে দিয়েছি নয়ন। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখছি। তবে আমার থেকেও তোমার সতর্ক হওয়াটা বেশি জরুরি। কারণ তুমি হচ্ছ মহীয়ান দত্তর বংশধর। কাজটা যে মহীয়ান দত্তই করেছেন, সেটা আমার মনে হচ্ছে ওরা আন্দাজ করেছে।”

“আমার মনে হচ্ছে ওরা আমার ডি এন এ পরীক্ষা করে দেখতে পারে। ওহ হো, কী সাংঘাতিক ব্যাপার! আজই তো ওরা আমাদের সবার ব্লাড স্যাম্পল নিল। বলল কী একটা প্রজেক্টের জন্য যেন দরকার আছে।”

চমকে ওঠে নীল, “কী সর্বনাশ! তুমি রক্ত দিয়েছ?”

“না দেওয়ার তো কোনও উপায় নেই। সত্যি কথা বলতে কী, আমার সন্দেহও হয়নি কিছু। এখন তো আবার ট্যাবলেট এক্সপোর্ট শুরু হয়ে গিয়েছে। আর কাউকে ডেকে কিছু বলাও হয়নি। আমি নিজেও অনেকদিন অ্যান্টিডোট মেশানো বন্ধ রেখেছি। তাই ভেবেছিলাম পিউ বোধ হয় হাল ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু এখন দেখছি মোটেই তা নয়।”

“একেবারেই নয়। আমারা ধারণা তোমাকে ফাঁদে ফেলার জন্যই ওরা এরকম একটা গা-ছাড়া ভাব দেখাচ্ছে। আসলে ওরা একটু-একটু করে জাল গুটিয়ে আনছে।”

ভূমধ্যসাগরের একটা নির্জন দ্বীপে সমুদ্রের ধারে পিউ-এর মিটিংয়ে বসে ঠিক এই জাল গুটিয়ে আনার কথাটাই বলছিলেন টিমোথি, “আমি এখন মোটামুটি নিশ্চিত যে, অ্যান্টিডোটটা তৈরি করেছেন মহীয়ান দত্ত। ওঁর ওইরকম একটা ছোট্ট ল্যাবরেটরিতে বসে কীভাবে কাজটা করলেন সেটা অবশ্য বলতে পারব না। তবে মারা যাওয়ার আগে তিনি নয়ন দত্তকে অ্যান্টিডোটটা দিয়ে গিয়েছেন সেটাও বুঝতে পারছি। আমার মনে হয় নয়নের বাড়ি তল্লাশি করলে এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণও পাওয়া যাবে। সেই কারণেই ওকে সারাক্ষণ মনিটার করার ব্যবস্থাও হয়েছে। ডঃ দত্ত যে নয়নকেই এই কাজের ভার দিয়েছেন তারও একটা কারণ আছে। ডি এন এ পরীক্ষা করে আমরা বুঝতে পেরেছি যে নয়ন একজন স্বাভাবিক মানুষ। তার ডি এন এ কারেকশন করা হয়নি। ডঃ দত্ত সুরানাকে বলেছিলেন যে, তিনি নিজে কারেকশনের কাজটা করবেন। কিন্তু তিনি কোনও কারেকশনই করেননি। তার মানে তখন থেকেই হয়তো তিনি খুব সচেতনভাবে পরিকল্পনা করে নয়ন দত্তকে এই কাজের ভার দেবেন বলে ঠিক করেছিলেন। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। কারণ কোনও ডি এন এ কারেকশন করা মানুষ যে একাজটা করতে পারবে না, সেটা ওঁর থেকে ভাল আর কে জানে?”

“কিন্তু নয়ন দত্ত ওই ল্যাবরেটরিতে কাজ করলেও সে তো বাচ্চাদের ট্যাবলেট তৈরি করে না। যদি ওর কাছে অ্যান্টিডোট থাকেও, তা হলে ও সেটা ট্যাবলেটে মেশাবে কী করে?”

“এইখানেই এখনও পর্যন্ত একটা ছোট্ট মিসিং লিঙ্ক রয়েছে। এই মুহূর্তে আমাদের লোকেরা হেনরি বার্টকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। যদি জানা যায় ওষুধটা তৈরির সময় নয়ন কোনওভাবে সেখানে ছিল, তা হলে আমরা সঙ্গে-সঙ্গে কাজে নেমে পড়ব।”

স্নান করে বেরিয়ে এসে চুল আঁচড়াচ্ছিল নীল। মনটা একটু ভার হয়ে রয়েছে। কীরকম যেন মনে হচ্ছে নয়নের চারপাশে একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে। এই কয়েক বছরে নয়নকে ভারী ভালবেসে ফেলেছে সে। তাই তাকে কী করে এই বিপদ থেকে বাঁচানো যায়, সেই চিন্তাটাই সারাক্ষণ তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। হঠাৎ টেবিলের উপর রাখা সোলার ডায়েরিতে সবুজ আলো জ্বালিয়ে বিপবিপ করে উঠল। সবুজ আলো মানে অচেনা কারও মেসেজ। নীলের চেনা মানুষ তো নয়ন ছাড়া আর কেউ নেই। তাই অচেনা নম্বর থেকে মেসেজ এলে সাধারণত খুলে দেখে না। কিন্তু আজ কী মনে হতে মেসেজটা খুলেই চমকে উঠল নীল। তাড়াতাড়ি বাথরুমের ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল আবার। নয়নের মেসেজ।

নয়ন লিখেছে, “আমার মনে হচ্ছে আমাকে ওরা ট্র্যাপ করে ফেলেছে। ইদানীং রোজই খেয়াল রাখছিলাম। আজ অফিসে এসে দেখলাম হেনরি নিজের সিটে নেই। খোঁজ নিয়ে জানা গেল ওকে নাকি উপরওলারা ডেকে পাঠিয়েছে। আমি যে প্রায়ই ফাইনাল মিক্সিংয়ের দিন হেনরির ঘরে যেতাম, সেটা হেনরিকে জিজ্ঞেস করলে ও নিশ্চয়ই বলে দেবে। আমার উপরও যে নজরদারি চলছে সেটাও স্পষ্ট। কারণ খবরটা পেয়েই আমি ঠিক করেছিলাম এখান থেকে বেরিয়ে যাব। কিন্তু হেনরিদের ডিপার্টমেন্ট থেকে নিজের ঘরে ফিরতেই রহিম শাহ ফোন করে বললেন, ওঁকে না জানিয়ে আমি যেন ল্যাব ছেড়ে কোথাও না যাই। আমার সঙ্গে ওঁর জরুরি দরকার আছে। আমি তারপরেও বেরনোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমার পাসকার্ড ইতিমধ্যেই ডিঅ্যাক্টিভেট করে দেওয়া হয়েছে। কার্ডের পাসওয়ার্ড দিয়েও দরজা খুলল না। মনে হচ্ছে এখন আর কিছু করার নেই। আমার কলিগ ফতিমা ওর সোলার ডায়েরিটা কাল ল্যাবে ফেলে চলে গিয়েছে। আজ ফতিমা আসেনি। তাই এটাতে তোমায় মেসেজ করছি। আমার ডায়েরিতে কিছু লেখা ঠিক হবে না। ওটা নিশ্চয়ই ওরা মনিটর করছে।”

মেসেজটা পড়ে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল নীল। তারপর লিখল, “তোমার ওখান থেকে বেরনোর আর কোনও রাস্তা কি আছে?”

নয়নের উত্তর এল সঙ্গে-সঙ্গেই, “একমাত্র উপায় সুপারসনিক কার। ওটা যাতে আমাদের অফিসের হ্যাঙ্গারে নামানো যায়, তার ব্যবস্থা করা আছে। কিন্তু আমি তো ওটা আজ নিয়ে আসিনি। অধিকাংশ দিনই নিয়ে আসি না। তাই হ্যাঙ্গারে যাওয়ার জন্য যে দরজা, তার পাসওয়ার্ড এখনও কাজ করছে। ওটা ওরা ডিঅ্যাক্টিভেট করা দরকার মনে করেনি।”

নীল লিখল, “তোমার সুপারসনিক কার নিয়ে আমি যাচ্ছি। তুমি বেরনোর দরজার কাছাকাছি থাকবে। আমি সিগন্যাল দিলেই বেরিয়ে এসে উঠে পড়বে।”

মেসেজটা পাঠিয়ে দিয়ে খুব স্বাভাবিক মুখ করে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল নীল। ভোলু তখন ঘরদোর ডাস্টিং করছে। তাকে বলল, “আমার আজকে ডাক্তারের সঙ্গে একটা ডেট আছে ভোলু। আমি একবার বেরচ্ছি। দুপুরের খাবারের আগেই ফিরে আসব।”

ভোলু মাথা নেড়ে সায় দিতেই তার চোখ এড়িয়ে দরজার পাশে আলমারির উপর ভাঁজ করে রাখা সুপারসনিক কারটা ব্যাগে ভরে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল নীল। নয়নের সঙ্গে নিয়মিত জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়ার সময় এই গাড়িটা চালানো সে খুব ভাল করে শিখে নিয়েছে। সুপারসনিক কারে নয়নদের ল্যাবে পৌঁছতে মিনিটদশেকের বেশি সময় লাগল না। সিগন্যাল আগেই দেওয়া ছিল। গাড়িটা এসে হ্যাঙ্গারে দাঁড়াতেই উঠে পড়ল তাতে। কোনও দিকে না তাকিয়ে গাড়ি নিয়ে আকাশে উড়ান দিল নীল।

হাতে সময় খুব কম। নয়ন যে ওখান থেকে পালিয়েছে সেটা বুঝতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। আর তারপরেই ব্লাডহাউন্ড কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে-শুঁকে তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়বে পিউ-এর দলবল।

“আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি নীল?” ভীষণ উদ্বিগ্ন আর বিষণ্ণ গলায় জানতে চায় নয়ন।

“আপাতত তুমি আমাকে যেখান থেকে তুলে এনেছিলে

সেখানটায় যাব। বাকি কথা সেখানে গিয়ে বলছি। এখন অন্যমনস্ক হলে বিপদ বাড়বে।"

খুব দ্রুত কিন্তু নিপুণ হাতে গাড়িটাকে চালিয়ে জঙ্গলের ভিতর যে জায়গাটায় নীলকে প্রথম দেখেছিল নয়ন, সেখানে এসে গাড়িটাকে দাঁড় করাল নীল। তারপর নয়নের দিকে ফিরে বলল, "আজ তোমাকে কতগুলো কথা বলব নয়ন। এতদিন বলিনি। ভেবেছিলাম হয়তো বলার দরকার হবে না। কিন্তু এখন আর না বললেই নয়।"

নীলের গলায় কেমন যেন একটা অন্য রকম সুর। অবাক হয়ে বন্ধুর দিকে তাকায় নয়ন।

"গল্পটা শুরু করতে হবে একটু পিছন থেকে। প্রায় পাঁচশো বছর আগের কথা। পৃথিবী তখন একটা সাংঘাতিক সংকটের ভিতর দিয়ে চলছে। বাতাসে দূষণ ভীষণ বেড়ে গিয়েছে। ক্রমশ বাড়ছে তাপমাত্রা। গলে যাচ্ছে মেরুপ্রদেশের হিমবাহ। বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারছিলেন এভাবে চললে পৃথিবীর অস্তিত্ব খুব বেশিদিন টিকে থাকবে না। তখন তাঁরা একটা সিদ্ধান্ত নেন। একদল বিজ্ঞানী প্রাণপণে গবেষণা করতে থাকেন কীভাবে পৃথিবীকে এই বিপদ থেকে বের করে আনা যায়। আর-একদল বিজ্ঞানী, সঙ্গে কিছু নানা ধরনের উৎসাহী মানুষকে নিয়ে একটি মহাকাশযানে চেপে বেরিয়ে পড়েন, এই সৌরজগতের বাইরে কোথাও পৃথিবীর মতো বাসযোগ্য গ্রহ আছে কি না তার সন্ধানে। মজার ব্যাপার হচ্ছে দু'দলই কিন্তু নিজেদের লক্ষ্যে সফল হয়েছিলেন। প্রথম দলের সাফল্য তো তুমি নিজেই দেখছ। দ্বিতীয় দলটিও শেষ পর্যন্ত ঠিক পৃথিবীর মতোই সবুজ, জল আর অক্সিজেনে ভরপুর একটি গ্রহের সন্ধান পান। তার নাম তাঁরা দেন 'সেকেন্ড আর্থ' বা 'দ্বিতীয় বিশ্ব'। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সেখানে পৌঁছনোর পরে তাঁদের মহাকাশযানটি খারাপ হয়ে যায়। ফলে তাঁরা আর ফিরতে পারেন না, সেই নতুন গ্রহেই তাঁদের থেকে যেতে হয়। সেখানে তাঁরা বসতি তৈরি করেন। জনসংখ্যা ক্রমশ বাড়ে। পৃথিবীর মতোই লেখাপড়া, বিজ্ঞান, শিল্প সবেরই চর্চা চলতে থাকে। কিন্তু বুঝতেই পারছ বিজ্ঞানের চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেসব উপকরণ দরকার, তার অনেক কিছুই তো সেখানে নেই। তাই এখানে যেমন সভ্যতা অনেক দ্রুত এগিয়েছে, ওখানে সেরকমটা হয়নি।

"কিন্তু তা হলেও প্রায় পাঁচশো বছরের চেষ্টায় বিজ্ঞানীরা শেষ পর্যন্ত এমন একটা মহাকাশযান বানাতে সক্ষম হন যেটাতে চড়ে আগের পৃথিবীতে ফিরে আসা যায়। কিন্তু সেই পৃথিবী কেমন আছে, আদৌ আছে কি না, তা তো কেউ জানে না। হতেই পারে ক্রমশ গরম হতে-হতে পৃথিবী একটা উল্কাপিণ্ডে পরিণত হয়েছে। মানুষের অস্তিত্বই মুছে গিয়েছে। তাই ঠিক হয়, প্রথমে আমি একাই আসব পৃথিবীতে। দেখব সেখানকার অবস্থাটা কীরকম। সেখানকার মানুষের সঙ্গে মিশব, কথা বলব। আমার কাছ থেকে সব শুনে তারপর ঠিক হবে পরবর্তী পদক্ষেপ। যেদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় সেদিন তার একটু আগেই আমি এই পৃথিবীতে প্রথমবার পা রেখেছিলাম । নামার পর পা টলমলে ছিল। তাই পড়ে গিয়ে পাথরে মাথা ঠুকে অজ্ঞান হয়ে যাই। এবার বুঝতে পারছ তো সেদিন আমি কেন ডাক্তারকে বলেছিলাম যে, আমার কিছুই মনে পড়ছে না। সত্যি কথা বললে তখন তুমিও কি আমার কথা বিশ্বাস করতে?"

নয়নের হতবাক মুখের দিকে তাকিয়ে নীল একটু হেসে বলে, "সবই তো বললাম নয়ন। এবার তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তুমি কী করবে। সামনে দুটো রাস্তা খোলা আছে। পিউ-এর হাতে ধরা পড়ে বাকি জীবনটা ধ্বংস করে দেওয়া অথবা আমার সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বে চলে যাওয়া। তবে মনে রেখো দ্বিতীয় বিশ্ব তোমাদের এই পৃথিবীর থেকে এখনও প্রায় পাঁচশো বছর পিছিয়ে আছে। সেখানে এখনও মানুষ চাষ করে ফসল ফলায়। একশো বছরও কেউ বাঁচে না। অসুখ আর জরার কষ্ট দুই-ই তাদের পেতে হয়। তবে তারা কিন্তু মনের আনন্দে গান গায়, বাঁশি বাজায়, গল্প-কবিতা পড়ে। ছোট ছেলেমেয়েদের ডি এন এ কারেকশন হয় না, তারা নিজেদের খুশিমতো বেড়ে ওঠে..."

নীলের কথায় বাধা দিয়ে নয়ন বলে ওঠে, "কিন্তু নীল এটা কি পালিয়ে যাওয়া হবে না? আমি যে মহীদাদুকে কথা দিয়েছিলাম, তাঁর স্বপ্নপূরণ করব।"

"সে কথা তো তুমি রেখেছ। যে লক্ষ-লক্ষ ছেলে-মেয়ে ওই অ্যান্টিডোট খেয়েছে, তারা তো স্বাভাবিক মানুষ হিসেবেই বড় হবে। পিউ-এর কথা মতো তারা চলবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, একদিন তারাই পিউ-এর সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেবে। তখন যদি আবার আমার মতো কেউ এখানে আসে, তা হলে সে নিশ্চয়ই ফিরে গিয়ে শুভ সংবাদটি জানাবে।"

নয়ন এবার দু'হাতের মুঠোয় নীলের হাতটা চেপে ধরে বলে, "বেশ তাই হোক তা হলে। চলো, তোমার সঙ্গে তোমাদের বিশ্বেই যাই..."

নীল এগিয়ে গিয়ে সেই বুনো গোলাপের ঝোপের পিছনে ফুলে ভরা কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে কিছুটা মাটি খুঁড়ে গোল চাকতির মতো একটা জিনিস বের করে। তারপর তাতে কতগুলো বোতাম টিপে আকাশের দিকে তুলে ধরতেই সেটা থেকে খুব সূক্ষ্ম একটা সরু আলোর রেখা বেরিয়ে দিগন্তে মিলিয়ে যায়। একটু পরেই যেখানে সেই আলোর রেখাটা মিলিয়ে গিয়েছে, সেখানে দেখা যায় একটা উজ্জ্বল রুপোলি বিন্দু। ক্রমশ সেটা বড় হতে থাকে। তারপর এক সময় একটা চারকোনা জিনিস নয়নদের ঠিক সামনে এসে দাঁড়ায়।

"উঠে পড়ো নয়ন। পিউ-এর লোকেরা জানতে পেরে গিয়েছে তুমি এখানে আছ।"

নীলের কথায় চমকে উঠে নয়ন দ্যাখে অনেক কুচকুচে কালো সুপারসনিক কার একটা দড়ির ফাঁসের মতো আকাশপথে তার দিকে ছুটে আসছে। আর দেরি না করে সে পা রাখে মহাকাশযানে। নীল উঠে দরজা বন্ধ করে বোতাম টিপতেই বিদ্যুৎগতিতে উপরে উঠতে থাকে মহাকাশযান। তার স্বচ্ছ দেওয়ালে চোখ রেখে নয়ন অবাক হয়ে দেখে কীরকম অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে তার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে প্রথম বিশ্ব!